সময় হইয়াছে, আর অপেক্ষা করা চলিবে না। তিনি বলিলেন—"আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী কর্‌তে পার্‌বে না, না ক্রোধে, না স্নেহে। তোমরা ভাব্‌চ তোমরাই আগুন লাগিয়েচ? না, এ আগুন যেমন ক'রেই হোক্ লাগ্‌ত। আজ আমার বন্দী থাক্‌বার অবকাশ নেই।" অভিজিৎ বলিলেন,—"জন্মকালের ঋণ শোধ কর্‌তে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন কর্‌ব।" এই বলিয়া অন্ধকারের মধ্যে অভিজিৎ চলিয়া গেলেন—

"কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার
শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত!"

বাউল গাহিল—

"ও ত আর ফির্‌বে না রে, ফির্‌বে না আর,
ফির্‌বে না রে!"

অমাবস্যার রাত্রি অন্ধকার হইয়া আসিল। যন্ত্রের চূড়াটা অন্ধকারে ভূতের মতন কালো দেখাইতেছে, কিন্তু ভৈরব-ত্রিশূল আর স্পষ্ট দেখা যায় না। যুবরাজ বন্দীশালায় নাই শুনিয়া উত্তরকূটের অধিবাসীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; যুবরাজকে তাহারা রাত্রির অন্ধকার পথে পথে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। নন্দিসঙ্কটের ভাঙা গড় নূতন করিয়া গাঁথিয়া তুলিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে, যন্ত্ররাজ বিভূতির দলবল রাত্রির অন্ধকারে গোপনে শিবতরাইএ যাত্রা করিয়াছে, পথে যাহাকে পায় জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া চলিল। শিবতরাইয়ের প্রজারাও পথে বাহির হইয়াছে যুবরাজকে খুঁজিবার জন্য।

মশাল নিবিয়া গিয়াছে, বাতি জ্বলিতেছে না, রাত্রির অন্ধকারে দলে দলে লোক পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে না, কে কোন্ দিকে চলিয়াছে ঠাহর পায় না, শুধু যন্ত্রের চূড়াটা তখনও যেন ইসারা করিতেছে।

অন্ধকারে বৃদ্ধ বটুক ডাকিতেছে—"জাগো, ভৈরব জাগো!" অম্বা পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিতেছে—"সুমন! বাবা সুমন! অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল!" বৈরাগী গান ধরিলেন—

প্রহর জাগে প্রহরী জাগে,
তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

অন্ধকারে আবার শোনা গেল অথার ক্রন্দন—"মা ডাকে! মা ডাকে! ফিরে আয়, সুমন, ফিরে আয়!" এমন সময় ভৈরবের ডমরু বাজিয়া উঠিল। হঠাৎ শোনা গেল মুক্ত-ধারার বাঁধন-ভাঙা জলোচ্ছ্বাস। বৈরাগী গাহিলেন—

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে হৃদয় মাঝে।

কুমার সঞ্জয় আসিয়া খবর দিলেন যে যুবরাজ অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভাঙিয়াছেন, কিন্তু যন্ত্রাসুরও তাঁহাকে আঘাত ফিরাইয়া দিল, মুক্তধারা অভিজিতের আহত দেহকে কোলে তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অন্ধকারে জলস্রোতের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল আর বাজিতে লাগিল ভৈরব-মন্ত্র—

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর।
জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর
শঙ্কর শঙ্কর!

(২)

যুবরাজ অভিজিৎ ছিলেন সকলেরই প্রিয় উত্তরকূটের অধিবাসীরা তাঁহাকে সত্যই ভালবাসিত, উত্তরকূটের মেয়েরাও জানে যে "উনি ত সবারই হৃদয় জয় ক'রে নিয়েছেন।" অথচ অভিজিৎকে নিজের দেশের লোকের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। মহারাজ রণজিৎ দুঃখ করিয়াছেন—"এ-যে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।" যুবরাজ অভিজিৎ যখন বাঁধ ভাঙ্গিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন তখন যন্ত্ররাজ বিভূতিও এই আক্ষেপই করিয়াছেন—"স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? তিনি কি আমাদেরই নন্? তিনি কি শিবতরাইয়ের?"

কিন্তু শুধু শিবতরাইয়ের দুঃখ দূর করিবার জন্য যুবরাজ প্রাণ দিয়াছেন বলিলে তাঁহার আত্মোৎসর্গকে ছোট করিয়া দেখা হইবে। এক হিসাবে শুধু অভিজিতের নহে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্ম মুক্তধারা ঝরণাতলায় পথের ধারে।

মানুষ জন্মলাভ করে মুক্ত অবস্থায়, জন্মকালে তাহার কোন বন্ধন থাকে না, ক্রমে সে নিজের বন্ধন নিজেই সৃষ্টি করে। প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করে, নানাপ্রকার ব্যবস্থার আয়োজন করে। কিন্তু উপায় যখন উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া যায়, প্রয়োজন যখন আনন্দকে অতিক্রম করে, ব্যবস্থামাত্রই তখন যান্ত্রিক হইয়া উঠে। যান্ত্রিক-ব্যবস্থা জীবনের গতিকে অবরুদ্ধ করে, সমস্ত মানুষের চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়ায়। যান্ত্রিক-বন্ধন শুধু যে আলাদা আলাদা করিয়া এক-একটি মানুষকে আঘাত করে তাহা নহে, সমস্ত মনুষ্যজাতিকে পীড়িত করিয়া তুলে। যেখানে বন্ধন সেইখানেই সমস্ত মানুষের বেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠে। অভিজিতের মতন যে মানুষ নিজের জন্ম-কথার অর্থ জানিয়াছে সেই বুঝিতে পারে এই বেদনা কি দুঃসহ, এই বন্ধন কি বীভৎস!

মানুষের হাতে বিধাতা প্রচণ্ড শক্তি দিয়াছেন, বস্তু-পিণ্ডের দ্বারা, উপায় উপকরণ ব্যবস্থা আয়োজনের দ্বারা কাজ করাইয়া লইবার শক্তি মানুষের ব্রহ্মাস্ত্র। এই ক্ষমতা কল্যাণের পক্ষে প্রয়োগ করিলে মঙ্গল। কিন্তু স্বার্থ যখন প্রবল হইয়া উঠে, লোভ যখন দুর্বলকে হিংসা করে, জাতীয় অহমিকা যখন প্রচণ্ড হইয়া উঠে, মানুষ তখন নিজের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র মানুষকে পীড়ন করিবার জন্য ব্যবহার করে, বিশ্বপাপ তখন বিকটমূর্তি ধারণ করে—

"ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত-ক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া,
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া!"

কিন্তু যান্ত্রিক-ব্যবস্থার বেদনা কোথায় গিয়া লাগে? যে অত্যাচার করে, যাহার হৃদয় কঠিন সে ত বেদনা অনুভব করে না। যে নিরপরাধ যে দুর্বল তাহাকেই বেদনা সহ্য করিতে হয়। কত মা পুত্রকে হারায়, কত স্ত্রী স্বামীকে হারায়, কত ভাই ভাইকে হারায়, কত নিরপরাধের সর্বনাশ হইয়া যায়। এইজন্যই ত পাপের আঘাত এমন নিষ্ঠুর। যেখানে পাপ, শাস্তি সেখানে আসে না। কিন্তু উপায় নাই, মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগকে

অপর সকলকেই ভাগ করিয়া লইতে হয়, কারণ অতীতে ভবিষ্যতে দূরদূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে পরস্পরের সহিত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। মানুষের মধ্যে আসলে কোন বিচ্ছেদ নাই। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করিতে হয়, বন্ধুর পাপে বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করিতে হয়।

একথা বলিলে চলে না যে অন্যের কর্মফল আমি ভোগ করিব কেন। কবি বলিয়াছেন—"হাঁ, আমিই ভোগ কর্‌ব এই কথা ব'লে প্রস্তুত হও। নিজের জীবনকে শুচি কর, তপস্যা কর, দুঃখকে গ্রহণ কর! তোমার নিজের জীবনকে যদি পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ না কর তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্মল থাক্‌বে কেমন ক'রে, প্রাণবান্ হয়ে উঠ্‌বে কেমন ক'রে? ওরে তপস্বী, তপস্যায় প্রবৃত্ত হ'তে হবে—সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই যদ্‌ভদ্রং তৎ—যা ভদ্র তাই আসবে।"

যাহারা দুর্বল যাহারা অক্ষম তাহারা অত্যাচারিত হয়। এই অত্যাচার, এই অবিচার, অক্ষমের অপমান, ভীত ত্রস্ত দরিদ্রের বেদনার পরিহাস বড় নিদারুণ। কিন্তু এই দুঃখকে জয় করা যায়। শিবতরাইয়ের প্রজারা মার খাইয়াছিল, অবিচলিত সহ্যশক্তির দ্বারা ধনঞ্জয় বৈরাগী দেখাইলেন যে মারের উপরেও জয়ী হওয়া যায়। বৈরাগী ধৈর্য্যের দ্বারা দুঃখকে জয় করিতে শিখাইয়াছেন, এ শিক্ষা সত্য শিক্ষা। যাহারা দুর্বল, যাহারা অত্যাচারিত তাহাদের পক্ষে এ শিক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

কিন্তু আরেক প্রকার দুঃখও আছে, সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে একত্র করিয়া যে একটি পরম বেদনা, পরম প্রেম রহিয়াছে তাহাও সত্য। সেইজন্যই এক জায়গার বেদনায় অপর জায়গায় আঘাত লাগে, পাপের বেদনায় সমস্ত বিশ্ব কাঁপিয়া উঠে, সমস্ত মানুষের প্রায়শ্চিত্ত সকল মানুষকেই করিতে হয়। যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল, দুঃখের আগুন তাহাকেই প্রথম দগ্ধ করে। সমস্ত মানুষের বেদনাকে যে লোক হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে সহ্যশক্তির দ্বারা শুধু দুঃখনিবৃত্তি করিয়া তাহার নিষ্কৃতি থাকে না—

"ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট-আবর্ত্তমাঝে, দিঁয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন
নির্য্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত!·····

.....শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক ! মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে—অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য্য-প্রতিমা !"

উত্তরকূটের অধিবাসীরা স্বার্থের উত্তেজনায় কত মানুষকে পীড়া দিয়াছে। শিবতরাইয়ের প্রজারা দুঃখ পাইয়াছে, বটুক দুঃখ পাইয়াছে, সুমনের মা দুঃখ পাইয়াছে. এ সকল দুঃখ সামান্য নহে—কিন্তু এ সমস্ত দুঃখ ফিরিয়া আসিয়া আঘাত করিল সকলের প্রিয় বেদনায় সকরুণ নীরব নম্র মহাপ্রাণ যুবরাজ অভিজিৎকে।

যাহার চিত্ত-তন্ত্রীতে আঘাত করিলে সব চেয়ে বেশি বাজে তাহাকেই সমস্ত পৃথিবীর বেদনা অধিক করিয়া আঘাত করে। তাহার চক্ষে তন্দ্রা ছুটিয়া যায়, বেদনার আঘাতে বন্ধন খসিয়া পড়ে, দূরদিগন্তে সে শুনিতে পায় রুদ্রের ভৈরব-মন্ত্র তাহাকে আহ্বান করিতেছে।—

"তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথ-হারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।"

সেইজন্যই, কুমার সঞ্জয় আসিয়া যখন মনে করাইয়া দিলেন "সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে ত সে-দিন তার সাম্‌নে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে ? তুমি জাগ্‌বার আগেই কোন ভোরে ঐ পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেচে, জান্‌তে দেয় নি সে কে—কিন্তু ঐটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে কর্‌বার নেই ? সেই ভীরু যে আপনাকে গোপন করেচে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন কর্‌তে পারেনি, তার মুখ কি

তোমার মনে পড়্চে না?" যুবরাজ অভিজিৎ বলিলেন—"পড়্চে বই কি! সেইজন্যই ত সইতে পাচ্চিনে ঐ বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ ক'রে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে হাস্য কর্চে। স্বর্গকে ভালো লেগেচে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই কর্তে যেতে দ্বিধা করিনে।" সমস্ত মানুষের ক্রন্দন যুবরাজ শুনিয়াছেন, কে তাঁহাকে ঘরে ধরিয়া রাখিবে?

"না রে না রে হবে না তোর স্বর্গসাধন
সেখানে যে মধুর বেশে
ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন।"

কুমার সঞ্জয় আসিয়া আবার বলিলেন—"যা কঠিন তার গৌরব থাক্‌তে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।" অভিজিৎ উত্তর করলেন—"ভাই, তারি মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা। আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে।—চেয়ে দেখ ঐ পাখী দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা কর্বে জানিনে; কিন্তু ও যে এই সূর্য্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ ক'রে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজ্‌চে। সুন্দর এই পৃথিবী, যা-কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেচে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।....ঐ দেখ সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্য্যাস্তের মূর্তি। কোন্ আগুনের পাখী মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেচে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য্য আকাশে এঁকে দিলে।"

"ওরে যাত্রী
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী,
চলার অঞ্চলে তোর ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।

বটুক যখন কাছে আসিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে শুনেচ বুঝি? ভৈরবের আহ্বান শুনেচ?" অভিজিৎ বলিলেন—"শুনেচি।" বটুক—

"সর্বনাশ! তবে ত তোমার নিষ্কৃতি নেই?" অভিজিৎ—"না, নেই।" বটুক—"সইতে পারবে কি যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে?" অভিজিৎ—"ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।" বটুক—"চারিদিকে সবাই যখন শত্রু হবে? আপন লোকে ধিক্কার দেবে?" অভিজিৎ—"সইতেই হবে।" বটুক—"তা হলে ভয় নেই।" অভিজিৎ—"না, ভয় নেই।"

যুবরাজ অভিজিৎ জানিতেন যে রুদ্রের প্রসাদ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

"পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্র-নাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ়ফণা!
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"

যুবরাজ অভিজিৎ বেশি কথা বলেন নাই. কারণ তাঁহার মনে কোন দ্বিধা ছিল না। তিনি কাহাকেও ডাকেন নাই: কাহাকেও তিনি সঙ্গে লইলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন—"আমার উপর যে কাজ পড়েচে সে একলা আমারই।"

কুমার সঞ্জয় অনুরোধ করিলেন—"যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী ক'রে নাও!" যুবরাজ সঞ্জয়কে কঠোর ভাবে বাধা দিয়াছেন—"না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথ আড়াল করব।" কুমার সঞ্জয় যুবরাজকে ভালবাসিতেন; নিজের ভালবাসাকে চরিতার্থ করিবার জন্যই তিনি যুবরাজকে অনুসরণ করিতে চাহিলেন। যুবরাজ একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন যে সঞ্জয়ের নিকট মুক্তধারার রহস্যের কোন অর্থ নাই, সঞ্জয়ের কানে মুক্তধারার আহ্বান পৌঁছায় নাই, তাই সঞ্জয়কে তিনি ঠেকাইয়া রাখিলেন। যুবরাজের কর্মের পুনরাবৃত্তিমাত্র করিয়া কোন ফল নাই, যুবরাজ যেমন নিজের পথে চলিয়াছেন সঞ্জয়কে সেই রকম নিজের পথ খুঁজিয়া চলিতে হইবে, যুবরাজের জীবনের ইহাই চরম শিক্ষা।

অভিজিৎ জানিতেন যে প্রত্যেক মানুষকেই নিজের পথ খুঁজিয়া চলিতে হইবে; এইজন্যই তিনি দল গড়িবার চেষ্টা করেন নাই। দলের মধ্যে নিজের পথ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। যাহারা দলে ভিড়িয়া পড়ে তাহারা উপলব্ধি করিবার অবসর পায় না যে সত্যকে অন্তরে অনুভব করিয়াছে কি না। দশের ইচ্ছায় অভিভূত হইয়া বুঝিতে পারে না যে দলের আদর্শ সত্যই নিজের আদর্শ নহে। দলের মোহ ক্রমে অসত্যকে প্রশ্রয় দেয়, বাঁধা বুলি আবৃত্তি করিয়া সত্যকে বাধাগ্রস্ত করিতে থাকে, সফলতা মাত্রকেই বাহিরের দিক দিয়া পাইবার চেষ্টায় সত্যকে খর্ব করে।

অভিজিৎ বুঝিয়াছিলেন যে সংখ্যাবাহুল্য অথবা আয়তন-বিশালতার দ্বারা সত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ হইতে পারে না, তিনি জানিতেন যে বিন্দুপরিমাণ সত্যের মূল্যও অসীম, তাই তিনি বারংবার বলিয়াছেন নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যবোধ তাহাকেই জাগ্রত কর, অন্যের মুখের দিকে তাকাইও না, বাহিরের সফলতার দিকে তাকাইও না। বিশ্বজিৎ যখন জানাইলেন– "তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে, তাদের ডাক্‌বে না?" অভিজিৎ বলিলেন—"যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুন্‌ত তবে আমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুল্‌বে।"

নিজের সম্বন্ধে যুবরাজের মনে কিন্তু কখনও সন্দেহ মাত্র হয় নাই, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সংকল্প স্থির, তাঁহার বিশ্বাস অচঞ্চল। অম্বাকে বলিলেন, সুমন যে পথে গিয়াছে তিনি নিজেও সেইপথেই যাইবেন। অম্বা বলিল –"যখন তার দেখা পাবে, বোলো মা তার জন্যে পথ চেয়ে আছে।" পরিপূর্ণ ভরসায় যুবরাজ শুধু একটি কথা বলিলেন—"বল্‌ব।" যাইবার সময়ে বিশ্বজিৎ যখন বড়ই ব্যাকুল হইয়া বলিলেন—"কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘট্‌বে।" অকম্পিত চিত্তে যুবরাজ উত্তর দিলেন—"তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে রেখো।" হৃদয়ে অপরিমিতা শান্তি লইয়া যুবরাজ চলিয়া গেলেন।

কুমার সঞ্জয় মুক্তধারার নিকটেও অভিজিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু অভিজিৎ কুমারকে আর অগ্রসর হইতে দিলেন না, একা চলিয়া গেলেন। সমস্ত দুঃখ সমস্ত পাপের সম্মুখে যেন একাই দাঁড়াইতে চাহিলেন।

"দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে ;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে ;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তা'রা স'রে যায়
জীবনেরে ক'রে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখ তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ!
তা'র পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বল অকম্পিত বুকে,—
'তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ!
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক!"

যুবরাজ অভিজিৎ জীবনের চরম মূল্য দিয়া সমস্ত মানুষের জন্য পথ মোচন করিয়া দিলেন, নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ভৈরবকে জাগাইলেন।[১]

এইরূপ করিয়াই ভৈরবের জাগরণ হয়। স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হইয়া, রিপুর আঘাতে আহত হইয়া মানুষ যখন প্রত্যেক পাশের লোককে আঘাত করে ও আঘাত পায়—সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্দনধ্বনি ভয়ানক বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনারূপে প্রলয়-নৃত্যে গর্জন করিয়া উঠে।

"মরণের গান
উঠেচে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে—

১। মে মাসের Modern Review পত্রিকায় "মুক্তধারার" ইংরেজি অনুবাদের পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখিয়াছেন—"I must ask my readers to treat it as a representation of a concrete fact of psychology" এবং যুবরাজ অভিজিৎই যে নাটকখানির প্রধান পাত্র এরূপ আভাস দিয়াছেন। এইজন্যই এতক্ষণ আমরা যুবরাজ অভিজিতের কথা আলোচনা করিয়াছি। "মুক্তধারা" নাটকখানির মধ্যে অবশ্য অন্যান্য অনেক কথা আছে, সুবিধা হইলে পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল
যত অশ্রুজল,—
যত হিংসা হলাহল
সমস্ত উঠেচে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।"

মানুষ বলে, "জাগো, ভৈরব জাগো! কঠিন আঘাতে সকল আঘাতকে নিরস্ত কর। সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুঞ্জীভূত—তুমি আজ সেই পাপ মার্জনা কর!"

সঞ্চিত বিশ্বপাপ যখন বিকটমূর্তি ধারণ করে, প্রেমিকের আত্মনিবেদনে ভৈরব তখন জাগিয়া উঠেন।

"স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতিমাঝে দারুণ আঘাতে
বিদীর্ণ বিকীর্ণ ক'রি চূর্ণ করে তা'রে
কাল-ঝঞ্ঝাঝঙ্কারিত দুর্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্দ্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট্ বিধান।"

যে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেয় জ্ঞানে জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করিয়া তুলিয়াছে, প্রলয়-মুহূর্তে তাহার সেই উদ্ধত ঐশ্বর্য্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া রুদ্রের মার্জনা নামিয়া আসে—

"গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়
সূর্য্যাস্তের প্রলয়লিখায়
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।"

যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে অবিশ্বাস করিয়া জড়তা, দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, দুর্ভিক্ষ ও মারী, প্রবলের অবিচার, আঘাতের পর আঘাতের দ্বারা তাহাকে অস্থিমজ্জার কম্পান্বিত করিয়া ভৈরবের আবির্ভাব হয়। অন্ধকার রাত্রে রুদ্রের-রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মত কাঁপিয়া উঠে—প্রলয়দাহের রুদ্র-আলোকে স্তূপাকার

পাপের দহনদীপ্তিতে ভৈরব আপনাকে প্রকাশ করেন।[১] সমস্ত বন্ধন ভাসিয়া যায়, চলাচলের পথ জুড়িয়া বাজিতে থাকে—

জয় ভৈরব জয় শঙ্কর
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর !

১। উদ্ধৃত অংশগুলি বলাকা (পৃঃ ৪৫, ৯৬, ৯৭, ১১৬, ১১৭), চিত্রা ("এবার ফিরাও মোরে", পৃঃ ১৯), গীতালি (পৃঃ ৫০) ও নৈবেদ্য (পৃঃ ৬৫, ৭৪) হইতে এবং অন্য কতকগুলি অংশ শান্তিনিকেতনী, ১৭শ খণ্ড, ("মা মা হিংসী", পৃঃ ৪৭ ও "পাপের মার্জনা" পৃঃ ৫৭-৫৯), ধর্ম ("দুঃখ", পৃঃ ১০৮) হইতে সামান্য পরিবর্তন করিয়া লওয়া হইয়াছে।

বিশ্ব-ভারতীর পূর্বাভাষ

তারিখ হিসাবে দেখলে ১৩২৮ সালে (১৯২১ খৃষ্টাব্দে) ৭ই পৌষ উৎসবের সময়ে বিশ্ব-ভারতী স্থাপিত হয়। কিন্তু এর সূত্রপাত তার অনেক আগে শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

ঠাকুর পরিবারের অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসের আয়োজনের মধ্যে একুশ বৎসরের যুবক দেবেন্দ্রনাথের সামনে কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল উপনিষদের একখানি ছেঁড়া পাতায় একটী শ্লোক :—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ কস্যসিদ্ধনং।

মনে প'ড়ে গেল রামমোহনের কথা। শৈশবকাল অবধি রামমোহনের সঙ্গে তাঁর সংশ্রব। রামমোহনের প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্তি তাঁর মনে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হ'য়ে আছে। অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে রামমোহন সম্পাদিত ইশোপনিষদের একটী শ্লোক দেবেন্দ্রনাথকে পথ দেখিয়ে দিলে।

পাঁচ বৎসর পরে, ১২৫০ সালে (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) ৭ই পৌষ তারিখে দেবেন্দ্রনাথ দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বোলপুর ষ্টেশন থেকে রায়পুরের পথে এক জায়গায় বিস্তৃত প্রান্তর, 'যতদূর দেখা যায় শুধু তৃণশূন্য তরঙ্গায়িত রক্তবর্ণ মরু-প্রান্তরের অবাধ প্রসার আর উপরে বর্ণচ্ছটা-বিচিত্র অসীম আকাশ'। মাঠের মাঝখানে শুধু দুইটী ছাতিম-গাছ। ১২৬৮ সালে (১৮৬১ খৃষ্টাব্দে) রায়পুরের সিংহ পরিবারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বোলপুরে গিয়ে জায়গাটী তাঁর বড়ো ভালো লাগলো। এখানে তাঁর নির্জন সাধনার উপযোগী একটী বাগান ও বাড়ী করার জন্য ১২৬৯ সালে জমি নেওয়া হয়। ছাতিম-গাছের তলায় তাঁর সাধনার স্থানে বেদীর উপর এখন লেখা আছে :—

"তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।"

এই শান্তিনিকেতনের আশ্রমের ব্যবস্থা-পত্রে আছে যে, এই আশ্রমে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে যে কোনো দেশের লোক ঈশ্বরোপাসনা করতে পারবেন ; এখানে সকলের অবাধ প্রবেশ।

মহর্ষির দীক্ষা ও শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার দিন, ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

"বহুকাল পূর্বে কোন্ একদিনে মহর্ষি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সে ক'জন লোকই বা জানত? কিন্তু এই দীক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারটীকে সেই সুদূর কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ ক'রে ফেল্‌তে পারে নি। সেই একটী দিনের মধ্যেই একে কুলিয়ে উঠ্‌ল না। সেদিন যার খবর কেউ পায়নি এবং তার পরে বহুকাল পর্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল সেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন আজ অমর হ'য়ে বাৎসরিক উৎসবের দিনে পরিণত হয়েছে।"

এই আশ্রমটীর মধ্যে তপোবনাত্মজ ভারতবর্ষের ও অনাগত কালের একটী নিগূঢ় আবির্ভাব আছে।

(খ)

কবির বাল্যকাল থেকেই তাঁর জীবনে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ এই দুই মনীষীর প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করেছে। রামমোহন সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :—

"তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করবার জন্য একদিন দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ করতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে ত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্য বঙ্গের পত্তন করিয়াছেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন;—আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে, পৃথিবীর যে-দেশে যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনিই আমাদের আপন, তাঁহাকে লইয়া প্রত্যেকে

ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সঙ্কুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন ; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্য্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস, কোনো ক্ষুদ্র অহঙ্কারবশতঃ মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই ;—যে অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়-পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।"

"বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য" (১২৮৪) প্রবন্ধে তিনি যেমন বাংলা দেশের আর্থিক দুরবস্থা ও তার প্রতিকারের সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের কথাও বলেছেন।

"ইউরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব, পূর্বদেশীয় গণ্ডীর ভাব ও পশ্চিম দেশীয় তৎপরভাব, ইউরোপের অর্জনশীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণশীলতা, পূর্ব-দেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্যকরীবুদ্ধি, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া কি পূর্ণ চরিত্র গঠিত হইবে।"

তিনি কল্পনার চোখে দেখেছেন যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে আবার এমন সব জ্ঞানালোচনার স্থান গড়ে উঠেছে যেখানে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আগত অতিথি সমবেত। কিশোর চিত্তের উদ্বোধনের সঙ্গেসঙ্গেই তাঁর কবি-মনে বিশ্বভারতীর এই মূল-ভাবটীর পূর্বাভাষ উদ্বোধিত হয়েছিল।

৩০ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের চাষীর সঙ্গে তাঁর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সুরু হয় তারই ফলে চাষীর অভাব মোচন ও গ্রামের উন্নতি নিয়ে তখন থেকে গত চল্লিশ বৎসর তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এসেছেন। ১২৯৯ সালে "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, "শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আমাদের প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রার উপযোগী ক'রে তুলতেই হ'বে, নইলে জাতির রক্ষা নাই।"

ভারতবর্ষের এই নানা সমস্যা ও তার সমাধানের চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের মনে ক্রমে প্রাচীন ভারতবর্ষের যে একটী ছবি গ'ড়ে উঠ্‌লো সে হচ্ছে তপোবনের মধ্যে লালিত ভারতবর্ষ। প্রাচীন ভারতবর্ষে সভ্যতার মূল প্রস্রবণ ছিল অরণ্যে, মানুষের মনের উপর বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাব তার ভিতরকার ভাব। "নিখিল

চরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক ক'রে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।"

"ভারতবর্ষের দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চ'লে গেছে,—বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগ। সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে।

"ভারতবর্ষের পুরাতন কথায় যা কিছু মহৎ, আশ্চর্য, পবিত্র, যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য সমস্তই সেই প্রাচীন তপোবন-স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজত্বের কথা সে মনে ক'রে রাখবার চেষ্টা করেনি, কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী ক'রে আজ পর্যন্ত সে বহন ক'রে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।"

১৩০১-২ সালে লেখা "ব্রাহ্মণ", "ধনে ও রাজ্যে", "সভ্যতার প্রতি", "বন", "তপোবন", "প্রাচীন ভারত", "ঋতু-সংহার", "মেঘদূত" প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও এই ভাবটী প্রকাশ পেয়েছে। কালিদাসের কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শের কথা বারবার বলেছেন। আসলে এ হচ্ছে কবির নিজেরই কথা। পনের বৎসর বয়সে লেখা, অধুনা-লুপ্ত, 'বনফুল' নামে ছোটো কাব্যটীতেও এই একই কথার আভাষ পাওয়া যায়।

বাংলা দেশের শিক্ষাসমস্যা নিয়ে ভাব্‌তে গিয়েও এই তপোবনের কথাই তাঁর মনে পড়েছে।—

"আমরা যদি মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাশ করা নয়—আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হবে।"

তাই ব'লে প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শের কথা বল্‌তে কবি কিন্তু আধুনিক বাংলা দেশের কথা ভোলেননি। তিনি নিজেই বলেছেন :—

"ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলি করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা-করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহা-রোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।"

আরও স্পষ্ট ক'রে লিখেছেন :—"অতএব আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে, মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।"

"যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক :—এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্রেরা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গরু থাকিবে এবং গো-পালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।"

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রাণ-উৎস সন্ধান ক'রে দেখতে গেলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, সুদূর ১২৫০ সালের ৭ই পৌষ যেদিন মহর্ষি দীক্ষা গ্রহণ করেন, সেইদিন সাধকের ধ্যানরত চিত্তে শান্তমদ্বৈতমের যে-মহিমা প্রকাশিত হ'য়েছিল এবং যে-মহিমার মঙ্গলালোকে শান্তিনিকেতনের আকাশ ও বনভূমি পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে, বিশ্বভারতীর প্রকৃত উদ্বোধন সেই মহিমার প্রকাশে—সেই বহুদূর অতীত কালের ৭ই পৌষে। কবির চিত্তে তারই প্রেরণা এবং পরিপূর্ণ মানবতার মধ্য দিয়ে দেশ-সেবার এই ভাবের উদ্বোধনই বিশ্বভারতীর কার্য-সূচনার প্রাণ-স্বরূপ। তাই বিশ্বভারতী আজ নিখিল জগৎ-সভায় ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সম্মানের আসনটী অনায়াসে অধিকার করেছে।

কবি-কথা

তিরিশ বছরেরও বেশী খুব কাছ থেকে কবিকে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে। যা দেখেছি সে সম্বন্ধে কিছু বলবার দায়িত্ব আমার রয়েছে। যা দেখেছি তার স্মৃতি আমার নিজের প্রগল্‌ভতা থেকে আমাকে রক্ষা করুক, আমার বাক্যকে গৌরবমণ্ডিত করুক।

অনেক বড়ো বড়ো আদর্শের কথা কবির লেখায় পাওয়া যায় তা সকলেই জানেন। কিন্তু যাঁদের সৌভাগ্য ঘটেছে কবিকে কাছে থেকে দেখবার তাঁরাই শুধু জানেন যে এই সব কথা কবির নিজের জীবনে কতখানি সত্য ছিল। আজ তিনি দূরে চলে গিয়েছেন, এখন আরো বেশী ক'রে মনে পড়ে তাঁর কথাবার্তা, হাসিঠাট্টা, জীবনযাত্রার ছোটখাটো খুঁটিনাটি জিনিসগুলির সঙ্গেও তাঁর লেখার গভীর মিল। রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিপূর্ণ রূপটিকে আমরা দেখেছি তাঁর নিজের জীবনের মধ্যে, এই আমাদের পরম সৌভাগ্য। রবীন্দ্র-সাহিত্য এক বিরাট ব্যাপার; শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের বস্তু। আজ সে আলোচনা নয়। যে পরম বিস্ময়কর জীবনটিকে দেখেছি সে সম্বন্ধে কিছু সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে আজ আমার এখানে আসা।

বিশ্ববোধ

উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে কবির পরিচয় হয় খুব ছেলেবেলায়। এই মন্ত্রগুলি ছিল তাঁর জীবনের আশ্রয়। তাই তাঁর সাধনার মধ্যে দেখি উপনিষদের শান্ত সমাহিত গম্ভীর ভাব। কোনো উচ্ছ্বাস নেই। কবির কাছে শুনেছি, আগে গায়ত্রী মন্ত্র ব্যবহার করতেন। পরে তাঁর ধ্যানের মন্ত্র ছিল "শান্তং শিবং অদ্বৈতম্"।

নিজের জীবনেও তাঁর পথ ছিল অত্যন্ত সহজ সরল। একখানি চিঠিতে লিখেছেন:

"আমার কাছে ধর্ম ভারী concrete যদিচ এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরকে কোনোরকমে উপলব্ধি করে থাকি বা ঈশ্বরের আভাস পেয়ে থাকি, তাহলে এই সমস্ত জগৎ থেকে, মানুষ থেকে,

গাছপালা, পশুপাখি ধুলোমাটি সব জিনিস থেকেই পেয়েছি।·····আকাশে বাতাসে জলে সর্বত্র আমি তার স্পর্শ অনুভব করি। এক-একসময় সমস্ত জগৎ আমার কাছে কথা কয়।

গানে কবিতায় বারে বারে বলেছেন :

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে।
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো-অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন,
আর আমার ভুবন।

কতবার বলেছেন, "সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে।" হয়তো গাছের পাতায় আলো পড়েছে, গেয়ে উঠেছেন, "এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।"

বোলপুর বা কলকাতায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অসহ্য গরম, দুপুরবেলা চারদিক রোদে পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু কখনো দরজা জানালা বন্ধ করতেন না। বর্ষার সময়েও দেখেছি হয়তো জানালা খুলে রেখেছেন যাতে অবাধে আসতে পারে "বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।" যখন বয়স কম ছিল, কালবৈশাখীর মেঘ আকাশে ঘনিয়ে এসেছে, বোলপুরের খোলা মাঠে ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। সারাবছর বিকাল থেকে খোলা ছাতে বসে থাকতে ভালোবাসতেন। বিলাতে শীতের জন্য দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে রাখতে হ'ত তাতে ওঁর মন খারাপ হয়ে যেত। বলতেন, "ভালো লাগে না, আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।"

বাইরের জগৎটা ওঁকে সত্যিই যেন পাগল ক'রে দিত। তাই লেখবার সময় জানালার কাছ থেকে দূরে সরে বসতেন। আমাদের আলিপুরের বাড়িতে যে ঘরে থাকতেন তার জানালা ছিল পূবদিকে—ঠিক সামনে অনেকগুলি পাম গাছ, তার পরে খোলা মাঠ, পিছনে বট অশোক আর অন্য সব বড়ো

বড়ো গাছ। লেখবার সময় টেবিলটাকে ঘুরিয়ে জানালার দিকে পিছন ফিরে বসতেন। বরানগরের বাড়িতে থাকতেন খুব ছোটো একটা কোণের ঘরে। সামনে একটা বড়ো জানালা দিয়ে পূব-দক্ষিণ কোণে দেখা যেত পুকুরঘাট আম সুপুরির বাগান্—তাই ঘরটার নাম দিয়েছিলেন "নেত্রকোনা"। এই ঘরেও লেখবার টেবিলটা রাখতেন জানলার কাছ থেকে সরিয়ে এক কোণে, যেখানে দুপাশে দেয়াল, কোনোদিকে কিছু দেখা যায় না। বলতেন, "খোলা জানলার কাছে বসলে আর আমার লেখা হবে না। আমার মন ঘুরে বেড়াবে ঐ বাইরে দূরে।" যখন কাজকর্ম শেষ হয়ে যেত তখন জানালার সামনে ইজিচেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

পঞ্চাশ বছরের জন্মোৎসবের আগে আমি প্রায় দু-মাস শান্তিনিকেতনে ছিলাম। কবি তখন থাকতেন অতিথিশালার দোতালায় পূবদিকের ঘরে। সবচেয়ে ছোটো এই ঘর। সামনে খোলা ছাদ। আমি থাকি পশ্চিমদিকের ঘরে। সে আমলে বাইরের লোকের আসাযাওয়া কম। কবির জীবনযাত্রাও অত্যন্ত সরল নিরাড়ম্বর। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে খোলা বারান্দায় গিয়ে বসতেন। আশ্রমের অধ্যাপকেরা কেউ কেউ দেখা করতে আসতেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে উঠত। অধ্যাপকেরা একে একে চলে যেতেন। রাত হয়তো এগারোটা বারোটা বেজে গিয়েছে, তখনো কবি অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে আছেন। আমি ঘুমোতে চলে যেতুম আবার সূর্য ওঠার আগেই উঠে দেখি কবি পূবদিকে মুখ করে ধ্যানে মগ্ন।

কোনো কোনো দিন হয়তো অন্ধকার থাকতে মন্দিরে পুবদিকের চাতালে গিয়ে বসেছেন পিছনে দু-চারজন লোক। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে হয়তো কিছু বললেন। "শান্তিনিকেতন" নামক বইয়ের অনেক ব্যাখান এইভাবে মুখে মুখে বলা।

তিরিশ বছরের বেশি এই রকমই দেখেছি। শেষ বয়সে যখন রোগশয্যায় অজ্ঞান তাছাড়া কখনো এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অসুস্থতার মধ্যেও অপেক্ষা করে থাকতেন কখন ভোর হবে। বার বার বলতেন, ভোর হোলো, আমাকে উঠিয়া বসিয়ে দাও।" যখন যে বাড়িতে থাকতেন পছন্দ করতেন পুবদিকের ঘর। যাতে প্রথম সূর্যের আলো এসে মুখে পড়ে। জানালা কখনো বন্ধ করতেন না। সূর্য ওঠার অনেক আগেই উঠে বসতেন, "শেষরাত্রে উঠে রোজ চেষ্টা করি নিজের ছোটো-আমির কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেই বড়ো-আমির

মধ্যে আপনাকে বিলিয়ে দিতে। পারিনে তা নয়, কিন্তু একটু সময় লাগে।" আমরা বলেছি, "ক্লান্ত শরীরে আরেকটু শুয়ে থাকলে ভালো হয়।" বলেছেন, "দেখেছি যে শেষ রাত্রে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ তখন সহজে এটা হয়। তাই ঘুমিয়ে এ সময়টা ব্যর্থ করতে ইচ্ছা হয় না। ছেলেবেলায় বাবামশায় রাত চার-টের সময় ঘুম থেকে তুলে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করাতেন তখন ভাবতুম কেন আরেকটু শুয়ে থাকতে দেন না। এখন তার মানে বুঝতে পারি। ভাগ্যিস তিনি এই অভ্যাস করিয়েছিলেন। এতে যে আমাকে কত সাহায্য করে তা বলতে পারি না।"

এই ভোরে ওঠা নিয়ে বিদেশে মজার মজার ব্যাপার ঘটত। নরওয়েতে ওঁর শোবার ঘরের পাশে আমাদের শোবার ঘর। মাঝে একটা ছোটো দরজা। প্রথম দিন সভাসমিতি অভ্যর্থনা সেরে শুতে যেতে দেরি হয়ে গেল। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনি দরজায় টক্‌টক্ করে আওয়াজ। কবি বলছেন, "আর কত ঘুমোবে? অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।" ঘরে চারদিকে কালো পর্দা টাঙানো। আলো জেলে ঘড়িতে দেখি রাত তিনটে। তখন গ্রীষ্মকাল, নরওয়েতে সূর্য ওঠে রাতদুপুরে। কবির ঘরেও কালো পর্দা টাঙানো ছিল, কিন্তু শোবার আগেই সরিয়ে দিয়েছেন। মাঝরাত্রে ঘর আলোয় ভরে গিয়েছে আর উনিও উঠে বসেছেন। আমাদের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আর থাকতে না পেরে আমাদের ডেকে তুলেছেন। যাহোক ওঁকে তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললুম, যে তখন রাত তিনটা। নরওয়েতে ভোরের আলো দেখে ওঠা চলবে না। সকাল চায়ের টেবিলে এই নিয়ে খুব হাসাহাসি হ'ল।

কত কবিতার মধ্যে বলেছেন, "প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রসন্ন পরশে অস্তিত্বের স্বর্গীয় সম্মান।" বলেছেন :

হে প্রভাতসূর্য
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল,
প্রভাত-ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করে আলোকিত···

ভোরবেলা যেমন রাত্রে শুতে যাওয়ার আগেও সেই চুপ করে বসে থাকতেন। বলতেন, "সারাদিনের ছোটখাটো কথা, সব ক্ষুদ্রতা, সমস্ত গ্লানি

একেবারে ধুয়ে মুছে স্নান করে শুতে যেতে চাই।" এর মধ্যে কোনো আড়ম্বর ছিল না। এমন কি এই যে প্রতিদিনের ধ্যানের অভ্যাস বাইরের লোকের কাছে তা জানাতেও যেন একটু সংকোচ ছিল। ওঁর নিজের কাছে এর এমন গভীর মূল্য আছে অন্য লোকের কাছে হালকা হয়ে যায়। যাদের সত্যি শ্রদ্ধা আছে তাদের সঙ্গে নিঃসংকোচে আলোচনা করতেন।

মন যখন বেশি ক্লিষ্ট তখন কোনো সময়ে নিজের মনে গান করতেন। কুড়ি বছর আগে ৭ই পৌষের উৎসবের সময় কোনো পারিবারিক ব্যাপারে কবির মন অত্যন্ত পীড়িত। একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কিছু হ'ল না। ৬ই পৌষ সন্ধ্যেবেলা শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁছেছি। কবি তখন থাকেন ছোটো একটা নতুন বাড়িতে – পরে এ বাড়ির নাম হয় 'প্রান্তিক'। শুধু দুখানা ছোটো ঘর। খাওয়ার পরে আমাকে বললেন, "তুমি এখানেই থাকবে।" লেখবার টেবিল সরিয়ে আমার শোবার জায়গা হ'ল। পাশেই কবির ঘর। মাঝে একটা দরজা, পর্দা টাঙানো। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনতে পেলুম গান করছেন "অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ"। বার বার ফিরে ফিরে গান চলল, সারারাত ধরে। ফিরে ফিরে সেই কথা, "অন্ধজনে দেহ আলো"। বিকাল থেকে মেঘ করেছিল, ভোরের দিকে পরিষ্কার হল'। সকালে মন্দিরের পরে বললুম, "কাল তো আপনি সারারাত ঘুমোননি।' একটু হেসে বললেন, "মন বড়ো পীড়িত ছিল তাই গান করছিলুম। ভোরের দিকে মন আকাশের মতোই প্রসন্ন হয়ে গেল।"

জীবন-দেবতা

কবি বার বার বলেছেন যে তাঁর জীবনে ছোটো বড়ো নানা ঘটনার মধ্যে তাঁর জীবন-দেবতার ইঙ্গিত তিনি দেখতে পেয়েছেন। অনেক কবিতায় আর গানে এই কথা পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি অনেকবার অনেক ব্যবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন হয়েছে, এমন কি অনেক সময়ে কবির নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও। প্রথমে মনে হয়েছে ভুল হ'ল, ক্ষতি হল কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে যে ভালোই হয়েছে।

পঞ্চাশ বছরের জন্মোৎসবের অল্পদিন পরেই কবির আগ্রহ হয় বিলাত যাওয়ার। ব্যবস্থা সমস্ত স্থির হয়ে গেল, কলকাতা থেকে সিটি-লাইনের

জাহাজে যাবেন। খুব ভোরে রওনা হওয়ার কথা। আগের দিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অনেক লোক কবির সঙ্গে দেখা করে গেলেন। রাত দশটা বেজে গিয়েছে; চলে আসবার সময় কবিকে প্রণাম করে বললুম, "ভোরবেলায় তাহলে একেবারে জাহাজঘাটেই যাব।" কবি বললেন, "হাঁ তাই তো ব্যবস্থা" হঠাৎ মনে খটকা লাগল। পথে আসতে আসতে ভাবলুম যে, এ-কথা কেন বললেন যে "তাই তো ব্যবস্থা"। তবে কি যাওয়া নাও হতে পারে? রাত্রেই ঠিক করলুম পরের দিন জাহাজঘাটে না গিয়ে একটু আগে বাড়িতেই যাব।

খুব ভোরে. রাস্তায় তখনো গ্যাসের আলো নেবেনি, জোড়াসাঁকোর তিনতলায় শোচার ঘরে গিয়ে দেখি যে কবির শরীর ভালো নেই। বিলাত যাওয়া স্থগিত। বিশেষ কিছু শক্ত অসুখ নয়, কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্তি আর অবসাদ। স্থির হল কিছুদিন কলকাতার বাইরে বিশ্রাম করবেন। এই সময় দীর্ঘ অবসর কাটাবার জন্য কতকগুলি বাংলা গান ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। এইরকম করেই ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখা হয়। এর কিছুদিন পরে কবি বিলাতে গেলেন। তার, পরের কথা সকলেই জানেন। এই ইংরেজি গীতাঞ্জলির মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষের বাইরে কবির বড়ো রকম পরিচয় শুরু হয়েছিল। আর এর জন্যই তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। ঠিক ঐ সময় বিলাত যাওয়া স্থগিত না হলে ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখা হ'ত কি না জানি না। কবির নিজের মনে কিন্তু সন্দেহ ছিল না যে ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখার সুযোগ ঘটবে বলেই সেদিন বিলাত যাওয়া বন্ধ হয়েছিল।

আবার অন্যরকমও হয়েছে। ১৯২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৬ই ভাদ্র কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে কবি আচার্যের কাজ করবেন কথা হয়। কবির শরীর কিন্তু তখন অত্যন্ত অসুস্থ। তার কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে কলম্বো পর্যন্ত গিয়ে বিলাত যাওয়া বন্ধ হ'ল— ওঁকে আমরা কলকাতায় ফিরিয়ে আনলুম। কলকাতায় আসবার পরে শরীর আরো খারাপ হয়ে পড়ল— ডাক্তাররা লোকজনের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিলেন। ভাদ্রোৎসবের আগের দিনেও এই রকম অবস্থা। ধরে নেওয়া হ'ল যে, আচার্যের কাজ করতে পারবেন না। তবু উৎসবের দিন খুব ভোরে আমি ওঁর কাছে গেলাম। আমাকে দেখেই বললেন, "আমাকে নিয়ে চলো, আমি মন্দিরে যাব।" অনেক হাঙ্গামা করে নিয়ে এলুম। মন্দিরে সেদিন যে শুধু উপাসনার কাজ করলেন তা নয়, নিজে থেকেই গান ধরলেন "তুমি

আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে।" আর ব্যাখ্যানের সময় গভীর বেদনার সঙ্গে, রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে তাঁর যা বলবার ছিল বললেন :

আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, রুদ্রের আহ্বান সেই মহাপুরুষকেও একদিন ডাক দিয়েছিল। রুদ্র নিজে তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। সেই আহ্বানের মধ্যে রুদ্রের প্রসন্নতা তাঁকে আশীর্বাদ করেছে। সুখ নয়, খ্যাতি নয়, বিরুদ্ধতার পথে অগ্রসর হওয়া এই ছিল তাঁর প্রতি রুদ্রের নির্দেশ। আজও সেই আহ্বান ফুরোয়নি। আজ পর্যন্ত তাঁর অবমাননা চলেছে। তিনি যে সত্যকে বহন করে এনেছেন দেশ এখনও সে-সত্যকে গ্রহন করেনি। যতদিন না দেশ তাঁর সত্যকে গ্রহণ করবে ততদিন এই বিরুদ্ধতা চলতেই থাকবে। দিনমজুরি দিয়ে জনতার স্তুতিবাক্যে তাঁর ঋণ শোধ হবে না। ক্ষুদ্রের হাতে তাঁকে অপমান সহ্য করতে হবে। এই হচ্ছে তাঁর রুদ্রের প্রসাদ।[১]

সেদিন খুব আবেগের সঙ্গেই সব কথা বলেছিলেন কিন্তু তার জন্য শরীর একটুও খারাপ হয়নি। বরং দুপুরবেলা বললেন, "আজ সকালে মন্দিরে গিয়ে খুব ভালো হয়েছে। আমার শরীরও ভালো আছে।"

রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে শুধু তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল তা নয় একটা আশ্চর্য রকম দরদও ছিল। এই প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনার কথা বলি। অসহযোগ আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় কবি তখন বিলাতে। দেশ থেকে তাঁর কাছে সকলে চিঠি লিখছেন। দেশের লোকের ইচ্ছা কবি দেশে ফিরে এসে আন্দোলনে যোগ দেন। কবি দেশে রওনা হলেন। আমরা খবর পেলুম যে, বম্বেতে একদিনও থাকবেন না। জাহাজঘাট থেকে সোজা ওভারল্যাণ্ড মেলে সকালবেলা বর্ধমান হয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যাবেন। কলকাতাতে আসবেন না। আগের দিন রাত্রে বর্ধমান চলে গেলুম, স্টেশনে রাত কাটল। ভোরবেলা, তখনো ভালো করে ফরশা হয়নি. ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছল। গাড়িতে উঠে প্রণাম করবার সময় দেখি কবির মুখ গম্ভীর। প্রথম কথা আমাকে বললেন "প্রশান্ত, রামমোহনকে যেখানে pygmy মনে করে সেই দেশে আমি ফিরে এলুম!" এতদিন পরে দেখা, এই হ'ল প্রথম সম্ভাষণ। তার পরে বললেন "আমি বিলেতে এণ্ড্রুজ সাহেব, সুরেন, সকলের চিঠি পাচ্ছি আর মনে মনে ভাবছি যে, দেশে ফিরে আমার যদি কিছু কর্তব্য

১। প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৩৪

থাকে তো তা করব। জাহাজেও সারাপথ নিজেকে প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেছি। বম্বেতে যখন জাহাজ পৌঁছল, দেশের মাটিতে পা দেওয়ার আগেই একখানা খবরের কাগজ হাতে পড়ল। তাতে দেখি, রামমোহন রায় pygmy কেননা তিনি ইংরাজি শিখেছিলেন—এই হ'ল দেশের প্রথম খবর। তখন থেকে সে-কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারছিনে।" সেদিন কবির মুখ দেখেই আমি বুঝেছিলুম অসহযোগ আন্দোলনে ওঁর যোগ দেওয়া হবে না।

তার কারণ এর অল্পদিন পরেই 'শিক্ষার মিলন' আর 'সত্যের আহ্বান' নামে কলকাতায় যে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে স্পষ্ট করে কবি নিজেই বলেছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়েই এক দেশের মানুষের সঙ্গে আরেক দেশের মানুষের সত্যিকারের মিলন। ভারতবর্ষ চিরদিন তার হৃদয়ের ক্ষেত্রে সর্বমানবকে আহ্বান করেছে, তার আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সংকুচিত হয়নি। রামমোহনও এই বাণীকেই বহন করে এনেছিলেন, আর ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে দিয়েই তিনি ভারতবর্ষের সঙ্গে নিখিলমানবের যোগসেতুটিকে নূতন করে রচনা করেছিলেন। কবি নিজেও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলার কথায় তাঁর মন সায় দিতে পারেনি।

আরেক দিনের ঘটনা বলি। বিশ্বভারতী যখন প্রতিষ্ঠা হয় সেই সময়কার কথা। বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন তখন পুরোমাত্রায় চলেছে। দেশের লোকের সকলের ইচ্ছা যে সে-সম্বন্ধে, বিশেষত কলকাতায় পুলিশের ধরপাকড় লাঠি-চালানো সম্পর্কে কবি কিছু লেখেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো নেতারা নিজে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবিকে অনুরোধ করলেন আর কবিও কিছু লিখতে রাজী হলেন।

সেইদিনই বিকালের গাড়িতে শান্তিনিকেতনে পৌঁচেছি। তখন শীতকাল, সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। শুনলুম কবি 'দেহলী'র দোতালায় ছোটো ঘরে বসে ঐ লেখাটিই লিখছেন। উপরে উঠে দেখি ঘর অন্ধকার, কবি স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, "আজ কী কাণ্ড জানো? ওঁরা সব এসেছিলেন, অনেক কথা হ'ল, আমাকে রাজী করিয়ে গেলেন কিছু লিখতে হবে। কী লিখব মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলুম কিন্তু সমস্ত বিকালবেলাটা কুঁড়েমি করে কিছুতেই লিখতে বসা হ'ল না। তার পরে সন্ধ্যেবেলা ভাবলুম যে, না, আর দেরি করা নয় এখনি লিখে ফেলি। লিখতে বসেও মনে মনে

সবটা আবার ভেবে নিলুম, ঠিক কোন্ কথাটা কোথায় কেমন করে গুছিয়ে বলব। কিন্তু কাগজ নিয়ে যেই কলম হাতে তুললুম হাত অবশ হয়ে এল। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু হাত থেকে আবার কলম খসে পড়ল। আমার জীবনে কখনো এমন ঘটেনি। কলম কখনো আমার হাত থেকে খসে পড়েনি। তার পরে চুপ করে বসে আছি। বুঝলুম এ লেখা আমার দ্বারা হবে না।"

এই নিয়ে সকলে বিরক্ত হয়েছেন। অনেকে বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেছেন। কবির নিজের মনে কিন্তু সন্দেহ ছিল না যে তাঁর বিধাতাপুরুষ সেদিন তাঁকে রক্ষা করেছিলেন এমন কিছু করা থেকে যা তাঁর অভিপ্রায় নয়।

বড়ো বড়ো ব্যাপারে যেমন ছোটখাটো ঘটনাতেও এই একই জিনিস দেখেছি। কবে কোথায় যাবেন, কবে কী করবেন তা অন্য লোক তো দূরের কথা তিনি নিজেও কিছু বলতে পারতেন না। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গিয়েছে অথচ বারে বারে দেখেছি সব কিছু বদলিয়ে গেল। বিলাত যাওয়াই শেষ মুহূর্তে বন্ধ হয়েছে চার-পাঁচবার। এ তো তবু বড়ো ব্যাপার। একবার মাদ্রাজ মেলে রওনা হয়ে খড়গ্‌পুর থেকে ফিরে এলেন। হাওড়া স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন তাও ঘটেছে। একদিনের কথা মনে আছে। লোকজন জিনিসপত্র হাওড়া স্টেশনে চলে গিয়েছে। হাওড়া-ব্রিজের সামনে রাস্তার পুলিশ হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাল। এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে বললেন, "গাড়ি ঘুরিয়ে নাও।" আমরা ফিরে এলাম।

মনে আছে ১৯২৬ সালে বুড'পেস্ট শহর থেকে যেদিন রওনা হব। প্রথমে কথা হ'ল, যে. কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল যাওয়া হবে—আমি পশ্চিমমুখী ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে জায়গা রিজার্ভ করলুম। একটু পরে বললেন, ওদিকে না গিয়ে, প্যারিসে ফিরে যাবেন। অবশ্য দুদিক থেকেই তাগিদ ছিল। আমি তখনি গাড়ি বদলিয়ে পুবমুখী ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে ব্যবস্থা করলুম। তারপর আবার কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল। আমরা যে হোটেলে ছিলুম তার একতলায় বুকিং আপিস। আমি তাদের বুঝিয়ে বললুম, কবির ইচ্ছা, পুব আর পশ্চিম দুদিকেই গাড়ি ঠিক করলাম। কবি যতবার মত বদলান, আমি অল্প একটু ঘুরে এসে বলি যে ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য টেলিগ্রাম আর টেলিফোন প্যারিসে করতে হ'ল অনেকবার। বুডাপেস্ট শহরে ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস দুদিক থেকেই রাত দশটা আন্দাজ পৌঁছায়। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাত্রে খেতে

বসলুম। এমন সময়ে একজন দেখা করতে এসে ধরে পড়লেন যে, তাঁদের দেশে ক্রোয়াটিয়ার (Croatia) রাজধানী জাগ্রেব (Zagreb) শহরে যেতে হবে। পূব বা পশ্চিম কোনদিকেই যাওয়া হোলো না। শেষ মুহূর্তে দক্ষিণদিকে জাগ্রেব-এর গাড়ি ধরলুম। খুব ভিড়। কবির খাতিরে অনেক কষ্টে সেদিন জায়গার ব্যবস্থা হ'ল। যাহোক্, এইভাবে ঐদিকে যাওয়ার ফলে সেবার সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক এই সব দেশের লোকের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল।

এইরকম শেষমুহূর্তে বারে বারে ব্যবস্থা বদলিয়েছে। নিজেই বলতেন "তা কী করব। একটা ব্যবস্থা হয়েছে বলেই যে সেটা মানতে হবে এমন কি কথা আছে। ব্যবস্থা যেমন হতে পারে আবার তেমনি বদলাতেও তো পারে।" দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাতে তাঁর এক সঙ্গী একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন যে দ্বারকানাথ অনেক সময় হঠাৎ সমস্ত ব্যবস্থা বদলিয়ে দিতেন। তাই তাঁর সঙ্গী বলেছিলেন, "Baboo changes his mind"। শেষ বয়সে কবি এই চিঠিখানা পড়েন, আর তার পর থেকে কবি অনেক সময় হাসতে হাসতে বলতেন "পিতামহ যা করেছেন পৌত্রও তো তা করতে পারেন। অতএব Baboo changes his mind !"

খানিকটা হয়তো কবির খেয়াল। কিন্তু তিনি নিজে মনে করতেন যে তাঁর বিধাতা-পুরুষ বড়ো বড়ো ব্যাপারে যেমন ছোটোখাটো ঘটনাতেও তেমনি করে কবির জীবনকে একটা কোনো বিশেষ দিকে নিয়ে গিয়েছেন। ১৩১১ সালে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে কবি একটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে নিজে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

কবির এরকম ধারণাও ছিল যে অনেক সময় বড়ো বিপদের আগে প্রস্তুত হওয়ার জন্য ইঙ্গিত পেয়েছেন। যাকে ভবিষ্যৎ জানা বলে তা নয়। অনিশ্চিত কোনো বিপদ বা মৃত্যুর জন্য তৈরি হওয়া ঠিক কী বিপদ ত না জেনেই। আমাকে একদিন বলেছিলেন যে-বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে কবির সহধর্মিণীর মৃত্যু হয়, তার কয়েক মাস আগে নববর্ষের সময় কবির মনে হ'ল সামনে খুব বড়ো রকম একটা দুঃখ বা বিচ্ছেদ আসছে। কথাটা এমন স্পষ্ট-ভাবে মনে হয়েছিল যে, কবি তাঁর স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন নিজেদের প্রস্তুত করবার জন্য।

নিজের সম্বন্ধেও অসুখ বা বিপদের কথা ওঁর আগে মনে হয়েছে দেখেছি। ১৯৪০ সালে বর্ষাকালে কালিম্পং রওনা হওয়ার আগের দিন রাত্রে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দেখি লালবাড়ির পশ্চিমদিকের কোণের ঘরে মুখ বিমর্ষ করে বসে রয়েছেন। বৌঠান (প্রতিমা দেবী) আগেই কালিম্পং চলে গিয়েছেন। তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য কবির যথেষ্ট আগ্রহ। অথচ মনে মনে একটা বাধাও অনুভব করছিলেন। আমাকে বললেন, "পাহাড়ে যেতে ভালো লাগছে না। এবার পাহাড়ে গেলে ভালো হবে না। কিন্তু এখন সব স্থির হয়ে গিয়েছে। বৌমা চলে গিয়েছেন। এখন আর বদলাতে চাইনে। কিন্তু ভিতর থেকে একটা অনিচ্ছা।" পরের দিন শিয়ালদা স্টেশন থেকে রওনা হওয়ার সময়েও দেখেছিলুম ওঁর মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ। হয়তো ওঁর অবচেতন-মন অজ্ঞাত কোনো ইঙ্গিত পেয়েছিল। কয়েকদিন পরেই কালিম্পঙে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অজ্ঞান অবস্থাতেই ওঁকে আমরা কলকাতায় নামিয়ে আনতে বাধ্য হলুম। এই তাঁর শেষ অসুখ।

১৯৪১ সালে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন শান্তিনিকেতনে যাই তখন অপারেশন করার কথা আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু কবির একটুও মত ছিল না। পরে রাজী হয়েছিলেন। আমার নিজের বরাবরই অপারেশন করা সম্বন্ধে আপত্তি ছিল। অপারেশন যেদিন করা হয় সেদিন সকালেও আমি দু-তিনজন ডাক্তারকে বলেছিলুম, যে, এখনো বন্ধ করা হোক। কিন্তু তার পরে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে রকম কাণ্ড চলেছে, আর ভারতবর্ষে, বিশেষত বাংলাদেশে, নানা দিক দিয়ে যে রকম দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে এখন মনে হয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কবি শেষ পর্যন্ত যে অপারেশনে মত দিলেন তাতে হয়তো ভালোই হয়েছে।

দুঃখবোধ

তাঁর জীবনে সব চেয়ে বড়ো কথা ছিল, "ভালোমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।" বলতেন, "ভালোমন্দ সব ছাড়িয়ে আরো বড় কথা হচ্ছে সত্য তাই তো আমাদের প্রার্থনা অসতো মা সদ্গময়। এতবড়ো প্রার্থনা আর নেই। প্রতিদিন নিজেকে বলি সত্য হও। যখন আত্মবিস্মৃত হই তাতে লজ্জা পাই, কারণ আমার সত্য-আমিটিকে তাতে ক'রে আবৃত করে দেয়। আমার প্রতিদিনের সাধনা তাকে আমি নির্মল ক'রে তুলব, সত্য ক'রে তুলব। নইলে আমার মধ্যে তাঁর প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হবে।"

গভীর শোকের সময়েও যে শান্ত থাকতে দেখেছি তার কারণ তাঁর এই সত্যদৃষ্টি। বলতেন, "জীবন যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনি সত্য। কষ্ট হয় মানি। কিন্তু মৃত্যু না থাকলে জীবনেরও কোনো মূল্য থাকে না। যেমন বিরহ না থাকলে মিলনের কোনো মানে নেই। তাই শোককে বাড়িয়ে দেখা ঠিক নয়। অনেক সময় আমরা শোকটাকে ঘটা করে জাগিয়ে রাখি পাছে যাকে হারিয়েছি তার প্রতি কর্তব্যের ত্রুটি ঘটে। কিন্তু এটাই অপরাধ, কারণ এটা মিথ্যে। মৃত্যুর চেয়ে জীবনের দাবি বড়ো।"

প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে কোনো স্মৃতিচিহ্ন আঁকড়িয়ে ধরে থাকা কবি পছন্দ করতেন না। লিপিকা বইয়ের 'কৃতঘ্ন শোক', 'সতেরো বছর', প্রথম শোক', 'মুক্তি' এই সব যখন লিখছেন সেই সময়ের কথা মনে আছে। একদিন সন্ধেবেলা জোড়াসাঁকোর তিনতলায় শোবার ঘরের সামনে বারান্দায় কবির কাছে বসে আছি। পশ্চিমদিকের আকাশ তখনো লাল, নিচে চিৎপুরের রাস্তায় অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সামনের গলিতে দু-একটা আলো জ্বলে উঠছে। দোতলায় যে-ঘরে কবি মারা যান ঠিক তার উপরে তিনতলায় ঐ শোবার ঘর ছিল মহর্ষিদেবের, তিনি ঐ ঘরেই মারা গিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় ঐ ঘরে তাঁকে দেখতে আসতুম। দক্ষিণদিকের দেয়ালে টাঙানো থাকতো একটা গির্জার ছবি—তার ঘড়িটা ছিল আসল। কম বয়সে সেইদিকে অনেক সময়ে চোখ পড়ত। সে-আমলের শুধু ঐ একটা জিনিসই বাকি ছিল—মহর্ষির সময়কার আর কোনো জিনিস ঐ ঘরে ছিল না। কবিকে এই সব কথা বলছিলুম। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কবি বললেন :

"সদর স্ট্রীটের বাড়িতে বাবামশায়ের তখন খুব অসুখ। কেউ ভাবেনি যে তিনি সেবার সেরে উঠবেন। এই সময় আমাকে একদিন ডেকে পাঠালেন। আমি কাছে যেতেই বললেন—আমি তোমাকে ডেকেছি, আমার একটা বিশেষ কথা তোমাকে বলবার আছে। শান্তিনিকেতনে আমার কোনো ছবি বা মূর্তি বা ঐরকম কিছু থাকে আমার তা ইচ্ছা নয়। তুমি নিজে রাখবে না। আর কাউকে রাখতেও দেবে না। আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি এর যেন অন্যথা না হয়।"

কবি বললেন, "বুঝলুম মৃত্যুর পরে তাঁর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে পাছে কোনোরকম বাড়াবাড়ি কাণ্ড ঘটে এই আশঙ্কায় তাঁর মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

বাবামশায় জানতেন এ বিষয়ে আমার উপরে তিনি নির্ভর করতে পারেন। তাই সেদিন আর কাউকে না ডেকে আমাকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।"

আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন 'আমার এক-একসময় কী মনে হয় জানো? রামমোহন রায় খুব বুদ্ধির কাজ করেছিলেন বিলাতে মারা গিয়ে। আমাদের দেশকে কিছু বিশ্বাস নেই। তাঁকে নিয়েও হয়তো একটা কাণ্ড আরম্ভ হ'ত। তিনি আগে থেকে তার পথ বন্ধ করে গিয়েছেন। আমার নিজের অনেক সময় মনে হয়েছে আমিও যদি বিদেশে মারা যাই তো ভালো হয়।"

সদর স্ট্রীটের বাড়িতে মহর্ষি যা বলেছিলেন তা এই একবার নয়, এর পরে কবি আরো দু-তিনবার আমাকে বলেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে মহর্ষির কোনো ছবি বা মূর্তি কখনো রাখা হয়নি, রাখা নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়। জোড়াসাঁকো বাড়ির তিনতলায় যে-ঘরে মহর্ষি মারা গিয়াছিলেন অনেকের ইচ্ছা ছিল যে এই ঘর তাঁর স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। মীরা আর রথীবাবুর কাছে শুনেছি এ নিয়ে অনেক আলোচনাও হয়েছিল কিন্তু কবি কিছুতেই রাজী হননি। কবি এই ঘর অন্য সব ঘরের মতোই ব্যবহার করেছেন। সে ঘরে মহর্ষিদেবের ছবি পর্যন্ত রাখেন নি।

কবির নিজের কাছেও কখনো কারো ছবি বা ফটো রাখতে দেখিনি। ছবি সম্বন্ধে যে কবির কোনো আপত্তি ছিল তা নয়। যে যখন চেয়েছে নিজের অসংখ্য ছবিতে নাম সই করে দিয়েছেন। আসলে ছবি কাছে রাখবার তাঁর কোনো প্রয়োজন ছিল না। ১৩২১ সালে কার্তিক মাসে কবি কিছুদিন এলাহাবাদে তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলির বাড়িতে বাস করেছিলেন। কবির কাছে শুনেছি এই বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, কবির নতুন-বৌঠানের একখানা পুরানো ফটো তাঁর চোখে পড়ে, আর এই ছবি দেখেই বলাকার 'ছবি'-নামে কবিতাটি লেখেন। তাতে আছে:

সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণেরে বাজায়ে কিঙ্কিণী।

'ছবি' কবিতাটি লেখবার কয়েকদিনের মধ্যে এলাহাবাদে বসেই লেখেন 'শাজাহান' কবিতা যার মধ্যে আছে:

সমাধি-মন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;

ধরার ধুলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখি ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

এ-সব কথা বারেবারে বলেছেন তাঁর লেখায় গানে কবিতায়। কিন্তু শুধু গান বা কবিতায় নয়, জীবনে তিনি কীভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন তাও দেখেছি বারেবারে।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল। বড়ো মেয়ে বেলা রোগশয্যায়। জোড়াগির্জার কাছে স্বামী শরৎচন্দ্রের বাড়িতে। কবি জোড়াসাঁকোয়। মেয়েকে দেখবার জন্য রোজ সকালে তাঁকে গাড়ি করে নিয়ে যাই। কবি দোতলায় চলে যান। আমি নিচে অপেক্ষা করি। রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল। রোজ যেমন যাই একদিন সকালে কবিকে নিয়ে ওখানে পৌঁছলুম। সেদিন আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি। কবি কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে গাড়িতে চড়ে বসলেন। তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন, "আমি পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবাব সময় খবর পেলুম তাই আর উপরে না গিয়ে ফিরে এসেছি।"

গাড়িতে আর কিছু বললেন না। জোড়াসাঁকোয় পৌঁছিয়ে অন্যদিনের মতো আমাকে বললেন, "উপরে চলো।" তিনতলায় শোবার ঘরে গিয়ে বসলুম। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "কিছুই তো করতে পারতুম না। অনেকদিন ধরেই জানি যে ও চলে যাবে। তবু রোজ সকালে গিয়ে ওর হাতখানা ধরে বসে থাকতুম। ছেলেবেলায় অনেক সময় বলত, বাবা গল্প বলো। অসুখের মধ্যেও মাঝে মাঝে ছেলেবেলার মত বলত, বাবা গল্প বলো। যা মনে আসে কিছু বলে যেতুম। এবার তাও শেষ হ'ল।" এই বলে চুপ করে বসে রইলেন। শান্ত সমাহিত।

সেদিন বিকালে ওঁর একটা কাজ ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, "আজকের ব্যবস্থার কি কিছু পরিবর্তন হবে।" বললেন, "না, বদলাবে কেন ? তার কোনো দরকার নেই।" আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো বুঝতে পারলেন

আমি একটু আশ্চর্য হয়েছি। বললেন, "এরকম তো আগে আরো হয়েছে।" তার পরে তাঁর মেজোমেয়ে মারা যাওয়ার সময়কার কথা নিজেই বললেন।

সে সময় স্বদেশী আন্দোলন চলেছে। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ব্যবস্থা নিয়ে দিনের পর দিন আলাপ আলোচনা পরামর্শ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশায় রোজ আসেন। আর রোজই অসুখের খবর নেন। যেদিন মেজো মেয়ে মারা যায় কথাবার্তায় অনেক দেরি হয়ে গেল। যাওয়ার সময় সিঁড়ির কাছে ত্রিবেদী মশায় কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কেমন আছে? কবি শুধু বললেন, সে মারা গিয়েছে। শুনেছি যে ত্রিবেদী মশায় সেদিন কবির মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন।

আর একটি শোনা কথাও এখানে বলি। কবির ছোটো ছেলে শমীন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে কলেরায় মারা যায়। কবি শেষমুহূর্তে গিয়ে পৌঁছলেন। মৃত্যুশয্যার পাশে গৃহকর্তা এমন অস্থির হয়ে পড়েন যে, সেদিন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন কবি স্বয়ং। তারপরে কবি যখন শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন সে-কথা শুনেছিলুম জগদানন্দবাবুর কাছে। তার এল যে, কবি ফিরে আসছেন। আর কোনো খবর নেই। জগদানন্দবাবুরা ভাবলেন যে শমীকেও সঙ্গে নিয়ে আসছেন। সে আমলের বাহন গোরুর গাড়ি নিয়ে সকলে ষ্টেশনে গেলেন। কবি একা ট্রেন থেকে নেমে এলেন। ওঁর মুখ দেখে কেউ কিছু বুঝতে পারেননি। পরে জিজ্ঞাসা করায় শুনলেন শমী মারা গিয়েছে। শান্তিনিকেতন ফিরে আসার পর সেদিনও কোনো কাজে কোথাও ফাঁক পড়েনি।

শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্প দিন পরে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে কবি বলেছিলেন :

"হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা। হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর মতো কাঁপিয়া উঠে তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড অবির্ভাবের মহাক্ষণে যেমন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি। হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি। সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়, যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া রাখিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়…

হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ, তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি।… হে ভয়ংকর, হে

প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্ত করণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্বাদ করো। তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি আবিরাবীর্ম এধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"[১]

শমী মারা যাওয়ার সময় কবিকে কেউ বিচলিত হতে দেখেনি। অথচ তার অনেক বছর পরে শমীর কথা বলতে বলতে চোখ ছলছলিয়ে এল, তাও একদিন দেখেছি। কুড়ি-একুশ বছর আগেকার কথা। কবির তখন জ্বর, জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘরে। ছুটির সময়ে রথীবাবুরা কলকাতার বাইরে। বাড়িতে কেউ নেই। সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি বেশ রীতিমতো চেঁচিয়ে কবিতা আবৃত্তি করছেন। আমাকে দেখে বললেন, "একটু জ্বর হয়েছে কিনা, তাই বোধ হয় মাথাটা উত্তেজিত আছে, কিছু চেঁচিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল।" এই বলে লজ্জিতভাবে একটু হাসলেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মনে পড়লো শমীন্দ্রের কথা। বললেন "শমীর ঠিক এইরকম হ'ত। ওর মা যখন মারা যায় তখন ও খুব ছোটো। তখন থেকে ওকে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলেম। ওর স্বভাব ছিল ঠিক আমার মতো। আমার মতোই গান করতে পারত আর কবিতা ভালোবাসত। এক-একসময়ে দেখতুম চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিংবা চেঁচিয়ে কবিতা আবৃত্তি করছে। এই রকম দেখলেই বুঝতুম যে ওর জ্বর এসেছে। ওকে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিতুম। আমার এই বুড়োবয়সেও কখনো কখনো সেই রকম হয়।"

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শমীর ছেলেবেলার কথা বলতে লাগলেন। "ওর জন্য অনেক কবিতা লিখেছি। শমী বলত, বাবা গল্প বলো। আমি এক-একটা কবিতা লিখতুম আর ও মুখস্থ করে ফেলত। সমস্ত শরীর মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আবৃত্তি করত। ঠিক আমার নিজের ছেলেবেলার মতো। ছাতের কোণে কোণে ঘুরে বেড়াত। নিজের মনে কত রকম ছিল

১। 'ধর্ম' "দুঃখ" মাঘোৎসব, ১৩১৪

ওর খেলা। দেখতেও ছিল ঠিক আমার মতো।" সেদিন দেখেছি শমীর কথা বলতে বলতে ওঁর চোখ জলে ভরে এসেছে।

আরো দেখেছি। কুড়ি বছর আগে, আলিপুরে হাওয়া-আপিসে তখন কাজ করি। কবি আমার ওখানে আছেন। কবির মেজ দাদা সত্যেন্দ্রনাথ তখন বালিগঞ্জের বাড়িতে অত্যন্ত অসুস্থ। একদিন খবর এল যে অবস্থা খারাপ। কবি চলে গেলেন। কাজে ব্যস্ত থাকায় আমি সঙ্গে যাইনি। খানিকক্ষণ পরে কবি ফিরে এলেন। মুখ গম্ভীর কিন্তু আর কিছু বোঝা যায় না। বললেন, শেষ হয়ে গিয়েছে। তার পর ঘরে গিয়ে অন্যদিনের মতোই নিজের কাজে মন দিলেন।

তখন আমার বাড়িতে আরেকজন অতিথি ছিলেন—একজন ইংরেজ, সার গিলবার্ট ওয়াকার। আমরা তিনজনে একসঙ্গে খাওয়ার টেবিলে বসতুম। সেদিন রাত্রে কবি নিজের ঘরে যদি আলাদা খেতে চান এই ভেবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম। বললেন, "না, তা কেন। একজন বিদেশী লোক রয়েছেন। আমি খাবার ঘরেই আসব।" সেদিনও খাওয়ার টেবিলে কথাবার্তায় কোথাও ফাঁক পড়েনি। মনে আছে, খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ ধ'রে ভারতবর্ষীয় ও পাশ্চাত্ত্য সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। আমার বিদেশী অতিথি সেদিন রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে আমাকে বললেন, "এর কথা অনেক দিন থেকে শুনেছি। লেখাও পড়েছি। আজ ওঁর একটা বড়ো পরিচয় পেলাম।"

আরেকদিনের কথা বলি। ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাস। কবি আমাদের বরানগরের বাগান বাড়িতে। কবির একমাত্র নাতি নীতু তখন বিলাতে। খুব সাংঘাতিক অসুখে ভুগছে। অল্পদিন আগে মীরা (নীতুর মা) এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে তার কাছে গিয়েছেন যতো শীঘ্র সম্ভব তাকে দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য। একদিন এণ্ড্রুজ সাহেবের চিঠি এল নীতুর অবস্থা একটু ভালো। তার পরের দিন ভোরবেলা কবি রানীকে বললেন, "যদিও সাহেব লিখেছেন যে নীতু একটু ভালো, তবু মন ভারাক্রান্ত রয়েছে।" তারপরে মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। আর শেষে বললেন, "ভোরবেলা উঠে এই জানালা দিয়ে তোমার গাছপালা বাগান দেখছি আর নিজেকে ওদের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করছি। বর্ষায় ওদের চেহারা কেমন খুশি হয়ে উঠেছে। ওদের মনে কোথাও ভয় নেই। ওরা বেঁচে আছে এই ওদের আনন্দ। নিজেকে যখন

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তখন সে কী আরাম। আর কোনো ভয়-ভাবনা মনকে পীড়া দেয় না। এই গাছপালার মতোই মন আনন্দে ভরে ওঠে।"

আমি এদিকে সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে দেখি, রয়টারের তার, নীতু মারা গিয়েছে। রথীবাবু তখন খড়দার বাড়িতে। তাঁকে ফোন করলুম। স্থির হ'ল তিনি এসে কবিকে খবর দেবেন। খানিকক্ষণ পরে রথীবাবু এলেন। দোতলায় কবির কাছে গিয়ে বললেন, "নীতুর খবর এসেছে।" প্রথমে কবি বুঝতে পারেননি। বললেন, "কি, একটু ভালো?' রবীন্দ্রনাথ বললেন, "না, ভালো নয়।" রথীন্দ্রনাথকে চুপ করে থাকতে দেখে বুঝতে পারলেন। তারপরে একেবারে স্তব্ধ। চোখ দিয়ে দু-ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। আর কিছু নয়। একটু পরে রথীন্দ্রনাথকে বললেন, "বুড়ি (নীতুর বোন) একা রয়েছে, বৌমা আজই শান্তিনিকেতনে চলে যান। আমি কাল ফিরব তোর সঙ্গে।"

সকালে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। কিন্তু তাও বেশিক্ষণ নয়। সেইদিনই বসে বসে "পুকুরধারে" নামে কবিতাটি লিখলেন। 'পুনশ্চ' নামে যে বইটি নীতুকে উৎসর্গ করা তাতে ছাপা হয়েছে। পরের দিন শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। সেখানে তখন বর্ষামঙ্গল উৎসবের আয়োজন চলছে। অনেকে নীতু মারা গিয়েছে বলে উৎসব বন্ধ রাখবার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু কবি বর্ষামঙ্গল বন্ধ রাখলেন না। নিজেও পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করলেন। এই সময় মীরাকে একখানা চিঠি লেখেন :

সমস্ত ভুলচুক দুঃখকষ্টের মধ্যে বড়ো কথাটা এই যে আমরা ভালোবেসেছি। বাইরে থেকে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু ভিতর দিকের যে সম্বন্ধ তার থেকে যদি বঞ্চিত হতুম তাহলে সে অভাব হ'ত গভীর শূন্যতা। এসেছি সংসারে, মিলেছি, তারপর আবার কালের টানে যেতে হয়েছে। এমন বারবার হ'ল, বারবার হবে। এর সুখ এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যতবার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে, সে চলছে, অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমার যাত্রা মেলাতে হবে।···নীতুকে খুব ভালোবাসতুম, তাছাড়া তোর কথা ভেবে প্রকাণ্ড দুঃখ চেপে বসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু সর্বলোকের সামনে নিজের গভীরতম দুঃখ করতে লজ্জা করে। ক্ষুদ্র হয় যখন সেই শোক সহজ জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে।....অনেকে বললে এবারে বর্ষামঙ্গল বন্ধ থাক্ আমার শোকের খাতিরে। আমি বললুম সে হতেই পারে না। আমার শোকের দায় আমিই নেব।.... আমার সকল কাজকর্মই আমি সহজভাবে করে গেছি।

যেরাত্রে শমী গিয়েছিল সেরাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতু চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন অনেকদিন ধ'রে বারবার ক'রে বলেছি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক।...শমী যেরাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়ছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে, কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তার মধ্যে। সমস্তের জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনোখানে কোনোসূত্রে যেন ছিন্ন হয়ে না যায়। যা ঘটেচে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে। ২৮শে আগষ্ট, ১৯৩২।

এই ভাবেই তিনি মৃত্যুকে গ্রহণ করেছেন। তাই কবিতাতেও তিনি জোরের সঙ্গে বলতে পেরেছেন :

দুঃসহ দুঃখের দিনে
অক্ষত অপরাজিত আত্মারে লয়েছি আমি চিনে।
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব
সেদিন ভয়ের হাতে হয়নি দুর্বল পরাভব।

তাই মৃত্যুর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছেন :

আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে
যাবো আমি চ'লে।

দয়া ও করুণা

মানুষকে শুধু শুধু নিজের কাজে ব্যবহার করা এ জিনিসটা তাঁর কাছে ছিল বর্বরতা। বারবার বলেছেন, সভ্যতার ভিতরের কথা প্রয়োজনকে

ছাড়িয়ে আরো বড়ো কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করা। যারা নিতান্ত সাধারণ মানুষ, দীনমজুর, বা চাকরের কাজ করে তাদেরও সুখসুবিধার দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। দুপুরবেলা চাকরদের কখনো ডাকতেন না। জানতেন ঐ সময় হয়তো তারা একটু বিশ্রাম করে। অপেক্ষা করে থাকতেন তারা নিজেরা যতক্ষণ না আসে। বেশি কিছু দরকার হলে নিজেই যা পারেন করে নিতেন।

সব সময়েই চেষ্টা ছিল যারা কাছে আছে তাদের সকলের সঙ্গে একটা হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করা। শেষবয়সে তাঁর পরিচারক ছিল বনমালী। তাকে নিয়ে কতরকম হাসিঠাট্টা করেছেন, গান গেয়েছেন। একদিন রাত্রে খাওয়ার পরে দু-তিনজনকে গান শেখাচ্ছেন। বনমালী ওঁর জন্য আইসক্রীমের প্লেট নিয়ে একবার এগিয়ে আসছে, আবার কাজের ব্যাঘাত করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে পিছিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সেদিকে কবির চোখ পড়ল, আর হাত ঘুরিয়ে গান ধরলেন, "হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে, কি, দ্বিধা কেন?" সকলে হেসে অস্থির। বনমালী একেবারে দৌড়। এই রকম কত ব্যাপার ঘটত। আবার বনমালীর বাড়ি থেকে কোনো বিপদের খবর এলে অস্থির হয়ে উঠতেন যতক্ষণ না ভালো খবর আসে।

নিতান্ত সামান্য লোককেও কখনো অবজ্ঞা করেননি। তাঁর কাছে যে কেউ চিঠি লিখেছে, যতদিন সক্ষম ছিলেন, নিজের হাতে উত্তর দিয়েছেন। দেখা করতে এলে কাউকে কখনো ফিরিয়ে দিতেন না। শরীর যতই অসুস্থ থাকুক, কাজের যতই ব্যাঘাত হোক তাতে আসে যায় না। একটা কিছু লিখছেন বা অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন, আমরা কাউকে হয়তো ঠেকিয়েছি, খবর পেলে মনে মনে বিরক্ত হতেন। বারবার বলতেন, "আহা, আর তো কিছু নয়। আমার সঙ্গে একেবার দেখা ক'রে যাবে। না হয় দুটো কথা বলবে। তার জন্যে এত হাঙ্গামা কেন? এতেই যদি খুশি হয়, এটুকু কি আমি দিতে পারিনে।"

শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু সম্বন্ধেও তাঁর ছিল অসীম করুণা। বিশেষ ক'রে যাদের কেউ দেখবার নেই, যাদের কথা কেউ ভাবে না। শখ করে কখনো পাখি বা জানোয়ার পুষতে দেখিনি। কিন্তু নিরাশ্রয় জন্তু এসে ওঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছে তা অনেকবার দেখেছি। শান্তিনিকেতনে কবির ঘরের সামনে পাখিদের জন্য জলের পাত্র ভরা থাকত। কবি রোজ নিজের হাতে তাদের খাবার দিতেন। শালিখ পায়রা চড়াই কতরকম পাখি ওঁর আশেপাশে ঘুরে

খুঁটিয়ে খাবার খেয় যেত। কাকের দলও মাঝে মাঝে আসত। সে কথা স্মরণ করে 'আকাশপ্রদীপ' বইয়ের 'পাখির ভোজ' নামে কবিতায় লিখেছেন :

এমন সময় আসে কাকের দল,
খাদ্যকণায় ঠোকর মেরে দেখে কী হয় ফল।
....প্রথম হোলো মনে
তাড়িয়ে দেব, লজ্জা হোলো তারি পরক্ষণে
পড়ল মনে, প্রাণের যজ্ঞে ওদের সবাকার।
আমার মতোই সমান অধিকার।
তখন দেখি লাগছে না আর মন্দ,
সকালবেলার ভোজের সভায়
কাকের নাচের ছন্দ।

শান্তিনিকেতনে একটা ময়ূর ছিল। কেউ তাকে খাঁচায় পুরে রাখবার মতলব করলেই কবির চেয়ারের পিছনে এসে বসত। চাকরবাকরেরা চারিদিকে ঘুরছে, সে আর নড়ে না। কখনো কখনো কবি চাকরদের সরিয়ে দিতেন, বলতেন, "পাখিটাকে একটু নিস্তার দে।" তখন সে স্বচ্ছন্দমনে ঘুরে বেড়াত। এই ময়ূরটির কথাও আকাশপ্রদীপ বইএর আর একটি কবিতায় লিখেছেন।

শেষের দিকে একটা লাল রঙের কুকুর আসত, তার নাম দিয়েছিলেন লালু। এটা রাস্তার কুকুর। উঁচুজাতের তো নয়ই। কিন্তু রথীবাবুর দামী পোষা কুকুরের চেয়ে এর সম্বন্ধেই কবির দরদ ছিল বেশি। রোজ নিজের পাত থেকে একে খাওয়াতেন। কুকুরটাও ছিল মজার। কবির কাছে তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সংযত। যতক্ষণ কবির খাওয়া শেষ না হয় চুপ করে পিছন ফিরে বসে থাকত। খাওয়া হয়ে গেলে ওকে ডাকলে তখন খেতে আসত। কিন্তু কেউ যদি ওকে বলত হ্যাংলা কুকুর, লজ্জা নেই, খাওয়ার জন্য লোভ করছে, অমনি চলে যেত। কবি অনেক সময় আমাদের ডেকে বলেছেন, "রাস্তার কুকুর কিন্তু এর আছে আসল আভিজাত্য।" 'আরোগ্য' নামে বইতে এই কুকুরটির কথা লিখেছেন :

প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে আসনের কাছে

যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার
করস্পর্শ দিয়ে।.....
ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা
বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না,
আমারে বুঝায়ে দেয়—সৃষ্টিমাঝে মানবের সত্য পরিচয়।

কবির শেষ অসুখের সময়ে যখন উত্তরায়ণের দোতলায় থাকতেন বলে দিয়েছিলেন যে লালু দোতলায় এসে তাঁকে একবার করে রোজ যেন দেখে যেতে পায়, কেউ যেন তাকে বাধা না দেয়।

আমাদের বাড়িতে যখন থাকতেন, দেখেছি যে আমাদের পোষা কুকুর কোনো দুষ্টুমি করেই ওঁর পায়ের কাছে বা চেয়ারের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। জানে যে সেখান থেকে আমরা টেনে এনে শাস্তি দিতে পারব না। তিনি অনেকবার লক্ষ্য করেছেন যে আমরা বাইরে চলে গেলে কুকুরটি অস্থির হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। আমাদের বলতেন, "আমার ভারি খারাপ লাগে। তোমরা হঠাৎ কেন চলে যাও, কখন ফিরে এসো কিছু বোঝে না, মন খারাপ করে বসে থাকে। ওদের কিছু বোঝানো যায় না, অথচ ওরা কষ্ট পায় দেখে আমারও মন খারাপ হয়ে যায়।"

যেসব গাছপালার কেউ যত্ন করে না তাদের প্রতি ছিল কবির বিশেষ টান। একসময়ে যখন শান্তিনিকেতনে 'কোণার্ক' নামে বাড়িতে থাকতেন পিছনের একটা উঁচু জায়গা ঘিরে নিয়ে কাঁটাগাছের বাগান তৈরি করলেন। সেখানে নানা জায়গা থেকে নানারকম বুনো কাঁটাফুলের গাছ সংগ্রহ করে রাখতেন। নিজের হাতে এই গাছগুলিতে জল দিতেন, আর আমাদের ডেকে বলতেন, "কী সুন্দর সব কাঁটাফুল একবার চোখ তুলে দেখো।" বেশির ভাগ ফুলের নাম জানা নেই। কত নতুন নাম তিনি নিজে রচনা করেছেন—সোনাঝুরি, বনপুলক, হিমঝুরি, বাসন্তী। কবির লেখার মধ্যে এইরকম অনেক ফুল আর গাছের কথা আছে যাদের দিয়ে আর কোনো কবি কখনো গান রচনা করেননি। এইসব দেখে সহজেই বোঝা যায় যে মহাকবিরা যাদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, যারা 'কাব্যের উপেক্ষিতা' তাদের কথাও রবীন্দ্রনাথ কেন স্মরণ করেছেন।

আসল কথা যারা সকলের কাছে ছোটো, যাদের সকলে অবজ্ঞা করে, কবির করুণা বিশেষভাবে তাদের দিকেই ধাবিত হয়েছে। সংসারে যারা

অভাগা, যারা অত্যাচরিত তাদের জন্য কবির মন চিরদিন পীড়িত। যৌবনের প্রারম্ভেই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় লিখেছিলেন :

....স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হ'তে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।.....

...এই সব মূঢ় ম্লান মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।....

গরিবদুঃখীদের কথা তিনি শুধু কবিতায় বলেননি। নানারকমে তাদের সাহায্য করেছেন। তাদের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করেছেন। জমিদারির কাজের মধ্যেও বারবার তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এখানে একটা সামান্য ঘটনার কথা বলি। জমিদারির একটা অংশ ছিল শিলাইদার কাছে কুষ্টিয়ার পাশে। পাঁচ-ছয় বছর আগে আমরা একদিন কুষ্টিয়া স্টেশনে নেমে নৌকা করে হিজলাবট গ্রামে যাচ্ছি। মাঝির বেশ বয়স হয়েছে। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করায় বললে যে, ঠাকুরবাবুদের জমিদারিতে। কৌতূহল হ'ল, জিজ্ঞাসা করলুম রবীন্দ্রনাথকে কখনো দেখেছে কিনা। যেই কবির নাম করা মাঝির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বললে, "হাঁ, দেখেছি বইকি। কতবার আমাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখেছি। আর কাছারি-বাড়িতে গিয়ে দেখে এসেছি। আহা! কী চেহারা। মানুষ তো নয়, দেবতা। সেরকম আর কখনো দেখব না। আর কী দয়া! যখনি ইচ্ছা সরাসরি তাঁর কাছে চলে যেতুম। কেউ আমাদের ঠেকাতে পারত না। তাঁর হুকুম ছিল, সকলেই কাছে যেতে পারবে। আমাদের দুঃখের কথা যখনি যা বলেছি তখনি ব্যবস্থা করেছেন।"

এই সময়ে কবির একবার হিজলাবটে বেড়াতে যাওয়ার কথা হয়েছিল। এই খবর শুনে মাঝি বললে, "আহা একটিবার যদি তাঁকে দেখতে পেতুম। কবে তিনি আসবেন? আমাদের যেন নিশ্চয় খবর দেওয়া হয়—আমরা সকলে এসে আরেকবার তাঁকে দেখে যাব।" আশ্চর্য ব্যাপার! এই বুড়ো মুসলমান মাঝি চল্লিশ বছর আগে তাঁকে দেখেছিল, কখনো ভুলতে পারেনি। ওঁর

কথা শুনে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বারবার বললে, "অমন মানুষ দেখিনি। অমন মানুষ আর হয় না।"

কবিকে পরে এই মাঝির গল্প করায় খুব খুশি হলেন। বললেন, "ওরা সত্যিই আমাকে ভালবাসত। কম বয়সে যখন প্রথম জমিদারির কাজের ভার নিলুম তখনকার একজন খুব বুড়ো মুসলমান প্রজার কথা মনে আছে। এক বছর ভাল ফসল হয়নি। প্রজারা খাজনা রেহাই পাওয়ার জন্য এসেছে। আমি বুঝলুম সত্যিই দুরবস্থা। যতটা সম্ভব খাজনা মাপ করতে বলে দিলুম। প্রজারা খুব খুশি হ'ল। কিন্তু এই বুড়ো মুসলমান প্রজা আমাকে এসে বললে, 'এত টাকা মাপ করছ, কর্তামশায় তো তোমাকে বকবে না? তুমি ছেলেমানুষ। ভেবে দেখো, বুঝেসুঝে কাজ করো।' সে আমাকে এত ভালোবাসত, যে, আমার জন্য তার ভয় হ'ল পাছে আমার দাদারা আমাকে তিরস্কার করেন।"

কবি যে পল্লীসংস্কারের কথা বারে বারে বলেছেন তার ভিতরের কথা হচ্ছে যে যারা গরিব দুঃখী চাষী তাদের জীবনকে কী করে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলা যায়। বিশ্বভারতীর মধ্যে শ্রীনিকেতনের কেন এতবড়ো জায়গা, কবিকে যাঁরা জানতেন তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন। বড়ো বড়ো আদর্শের কথা শুধু বইতে লেখেননি, কী করে সে-সব আদর্শ গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা যায় সারাজীবন সেই চেষ্টা করেছেন। যখন জমিদারি দেখতেন তখনো যেমন স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও তেমনি সেই একই চেষ্টা। যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন সমস্ত টাকা চাষীদের সাহায্য করার জন্য কৃষি-ব্যাঙ্কের কাজে লাগালেন। শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর মন পড়ে ছিল কিসে দেশের সাধারণ লোক ভালো করে দুটি খেতে পায়, কিসে তারা ভালো করে থাকতে পারে। সব মানুষকে ভালোবাসতে হবে একথা যেমন বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন তার প্রথম ধাপ হচ্ছে আশেপাশে যারা রয়েছে তাদের কল্যাণকর্মে নিজেকে নিযুক্ত করা। বড়ো বড়ো আদর্শ সম্বন্ধে কথার চাতুরীতে নিজেকে বা পরকে ভোলাননি। বরং তাঁর মনে একটা ভয় ছিল পাছে বড়ো বড়ো কথার ফাঁকে আসল কাজের জিনিসে ফাঁকি পড়ে। শেষ বয়সে তাই অনেক দুঃখে লিখেছিলেন :

> কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন,
> কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,

যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।

ধৈর্য ও উদারতা

মানুষের সম্বন্ধে ছিল আশ্চর্য ধৈর্য ও ক্ষমা। কারুর মতামত বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে কখনো হস্তক্ষেপ করেন নি। উপর থেকে কখনো কোনো চাপ দেননি। সব সময়েই চেষ্টা ছিল বুঝিয়ে বলে কিংবা নিজের উদাহরণ দেখিয়ে কাজ করানো।

তিরিশ বছর আগেকার কথা। আশ্রমের নিয়ম ছিল যে ছাত্র অধ্যাপক সকলেই ঘর আসবাবপত্র সমস্ত পরিষ্কার রাখবে। কিন্তু শিথিলতা ঘটত। একসময়ে কবি এই নিয়ে অনেক আলোচনা করেন কিন্তু আশানুরূপ ফল হয়নি। এই রকম একটা সময়ে সকালবেলায় গাড়িতে শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁচেছি। বিদ্যালয়ের ছোটো আপিসঘরটি তখন ছিল শালবীথিকায়। গিয়ে দেখি কবি নিজে একটা ঝাঁটা নিয়ে সমস্ত ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করেছেন। সকলে অপ্রস্তুত। অনেকে ওঁর হাত থেকে ঝাঁটা নিতে এল। উনি তাদের বাধা দিয়ে বললেন, "আহা, তোমরা তো রেজই করবে। আজ আমাকে করতে দাও।" এই বলে আর কাউকে সেদিন ঝাঁটা ছুঁতে দিলেন না। নিজের হাতে খুব পরিপাটি করে সমস্ত পরিষ্কার করলেন। এই ছিল তাঁর ঠিক নিজের মনের মতো পন্থা। জোর করে নয়, কিন্তু ইঙ্গিত দিয়ে কাজ করাতেই তিনি ভালোবাসতেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের যা মূল আদর্শ, কোনো জায়গায় তার কিছুমাত্র স্খলন না হয় সে সম্বন্ধে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। এইটুকু বাঁচিয়ে চললেই যার যে রকম মত হোক না কেন তাতে বাধা দেননি। শান্তিনিকেতনের মধ্যে

কবির নিজের আদর্শের বিরুদ্ধে আলোচনা, এমন কি আন্দোলনও, অনেকবার হয়েছে। কবি যা ভালোবাসেন না তাঁকে দেখিয়ে দেখিয়ে এমন কাজ বা আচরণ করা হয়েছে। আমরা অনেক সময়ে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছি; বলেছি, "আপনার জোর করে বারণ করা উচিত।" কিন্তু রাজী করাতে পারিনি। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সমস্ত সহ্য করেছেন। বলেছেন, "বাইরে থেকে জোর করে কিছু হয় না। জোর করে নিয়ম মানানো যায় এই পর্যন্ত। কিন্তু সে কতটুকু জিনিস? আসল কথা মানুষকে তার নিজের ভিতরের দিক থেকে বড়ো হতে দেওয়া।" বিশ্বভারতীর কর্মব্যবস্থার সঙ্গে দশ বছর আমি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলুম। দশ বছর কর্মসচিবের কাজ করেছি। অনেকবার মতভেদ ঘটেছে, বিরক্ত হয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু কর্ম-পরিচালনা সম্বন্ধে একদিনও আমার উপরে জোর করে কোনো হুকুম জারি করেননি।

যারা বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছে, নিন্দা করেছে, ক্ষতি করেছে, তাদের সম্বন্ধেও ছিল অদ্ভুত উদারতা। বাইশ-তেইশ বছর আগে একদিন বিকালে জোড়াসাঁকোয় লালবাড়ির দোতলায় বসে আছি। সে আমলের একজন নামজাদা সাহিত্যিক দেখা করতে এলেন। ইনি প্রকাশ্যভাবে কবির বিরুদ্ধে মাসের পর মাস অন্যায় অপমানজনক বিদ্রূপ ও সমালোচনা ক'রে এসেছেন। কলকাতায় কবির পঞ্চাশ বৎসরের জন্মোৎসবের সময়ে ইনি বিধিমতে বাধা দিয়েছেন। অনেক বছর কবির সঙ্গে এঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই এঁকে সেদিন আসতে দেখে আশ্চর্য হলুম। যা হোক, ইনি অল্প দু-চার কথা বলবার পরেই কবিকে জানালেন যে, তিনি একটা বার্ষিকী বের করছেন তার জন্য কবির একটা নতুন লেখা চাই। কবির হাতে তখন একটা ভালো লেখা ছিল। যেই এ-কথা শোনা তখনি সেই লেখাটা দিয়ে দিলেন।

এই ভদ্রলোকটি চলে যাওয়ার পরে আমি কবিকে বললুম, "আপনি এঁকেও লেখা দিলেন?" কবি একটু হেসে বললেন, "উনি বলেই তো আরো সহজে দিলুম। আমাকে সমালোচনা করেন, সে ওঁর ইচ্ছা। ঠাট্টা বিদ্রূপ নিন্দাও করেন। হয়তো তাতে ওঁর খ্যাতি বাড়ে। হয়তো অন্যদিকেও ওঁর সুবিধা হয়। কিন্তু এখন ওঁর নিজের দরকার পড়েছে তাই আমার কাছে এসেছেন। আমার একটা লেখা চাই। তা থেকে ওঁকে বঞ্চিত করি কেন? আমার তাতে কি এসে যায়?"

এরকম এক-আধবার নয়, অনেকবার ঘটেছে। একজন লেখকের কথা জানি যিনি কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে মুখে আনা যায় না এমন মিথ্যা কুৎসা ছাপার অক্ষরে রটনা করেছেন। কবি তা নিয়ে মর্মাহত হয়েছেন। বিচলিত হয়েছেন পাছে এরকম ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ বিনা প্রতিবাদে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের নজীর হয়। এই নিয়ে মানহানির মোকদ্দমা আনাতেও কবির অপমান এই ভেবে নিরস্ত হতে হয়েছে। অথচ পরে এই সাহিত্যিকটিই যখন আবার কবির কাছে এসেছেন তাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

আরেকজনের কথা কবির নিজের কাছে শুনেছি। একসময়ে সাহিত্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। ইনি নানারকমে কবির বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন, কিন্তু এই লোকটিকে কবি অনেকদিন পর্যন্ত প্রতিমাসে পঞ্চাশ টাকা করে সাহায্য করেছেন। বলতেন, "সাহায্য যখন করি তখন সব চেয়ে ভয় হয় পাছে তার জন্য কোনো দাম ফিরে চাই।" তাই এই লোকটির শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও মাসিক দান বন্ধ করেননি।

সকলের ভালো দিকটাই দেখতে চাইতেন তাই সহজেই সকলকে বিশ্বাস করতেন। কবির নিজের কাছে শুনেছি, বাংলাদেশে যেবার খুব বড়ো ভূমিকম্প হয় তারপরে রাজশাহী থেকে একখানা চিঠি পেলেন। একজন লিখেছে সে বিধবা, ভূমিকম্পে তার ঘরবাড়ি সব পড়ে গিয়েছে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে পথে দাঁড়িয়েছে। কবি তাঁকে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে লাগলেন। পরে কী এক উপলক্ষ্যে রাজশাহী যাওয়ায় এই পরিবারের খোঁজ করেন। তখন জানা গেল যে ঐ ঠিকানায় আদৌ কোনো বিধবা মেয়ে থাকে না। এক নিষ্কর্মা যুবক ফাঁকি দিয়ে কবির টাকায় বেশ আরামে দিন কাটাচ্ছে। এর পরেও কিন্তু হঠাৎ টাকা বন্ধ করলেন না। ছেলেটিকে ডেকে পাঠিয়ে তার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন।

কবি বলতেন, মানুষ দোষ করে, অপরাধ করে। কিন্তু তাই বলে কাউকে চিরকালের মতো দাগী করে দেওয়া চলে না। মানুষকে কখনো অবিশ্বাস করতে চাইতেন না। তাই অনেকবার তাঁকে ঠকতে হয়েছে। তাঁর নিজের কাছে শুনেছি, স্টীমারে পার হওয়ার সময়ে একবার একটি ছেলে কবি-গৃহিণীকে এসে বলে, যে তিনি তার আগের জন্মের মা। তার বড়ো সাধ যে সে রোজ সকালে মায়ের পাদোদক খায়। পূর্বজন্মের ইতিহাস হেসে উড়িয়ে দিলেও ছেলেটি জোড়াসাঁকোর সংসারে টিকে গেল। সে বললে, কলেজে ভর্তি

হয়েছে। খায় দায়, কলেজের মাইনে বই কেনার জন্য টাকা নেয়। কবি তাকে তাঁর লাইব্রেরি দেখবার ভার দিলেন। কিছুদিন পরে অনেকগুলি বই আর খুঁজে পান না। মনে মনে একটু সন্দেহ হ'ল, কিন্তু নিজেই তাতে লজ্জিত হলেন। যা হোক ছেলেটিকে ডেকে বললেন, অনেক বই পাওয়া যাচ্ছে না ভালো করে যেন খুঁজে দেখে। সে বললে, খুব ভালো করে তদারক করবে। কয়েকদিন পরে এসে বললে যে, সে বুঝতে পেরেছে কেন বই হারাচ্ছে। কী ব্যাপার? সে তখন খুব গম্ভীরভাবে কবিকে জানাল যে, সুরেনবাবু সুধীবাবু বলুবাবু এঁরা সব অবাধে লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করেন। কবি প্রথমে বুঝতেই পারেননি যে তাঁর ভাইপোদের লাইব্রেরিতে যাওয়ার সঙ্গে বই হারানোর কী সম্পর্ক থাকতে পারে। পরে ইঙ্গিতটা বুঝলেন, আর এমন কথা কেউ মুখে আনতে পারে দেখে নিজেই অপ্রস্তুত হলেন। কিন্তু কথাটা সুরেনবাবুদের জানালেন। তাঁরা ক্ষেপে অস্থির। খোঁজ করে দেখেন যে, ছেলেটি কলেজে ভর্তি হওয়া তো দূরের কথা এণ্ট্রান্স পরীক্ষাই পাশ করে নি। আরো খোঁজ পাওয়া গেল পুরানো বইয়ের দোকানে কবির বই বিক্রি করছে—কতকগুলি বই উদ্ধারও হ'ল কিন্তু এর পরেও ছেলেটি যখন কবির কাছে "পিতা, অপরাধী" ব'লে দাঁড়াল তখন তাকে পরিত্যাগ করতে পারলেন না। এই ছেলেটিরও একটা ব্যবস্থা করে দিলেন।

এইরকম করে কত লোক যে ওঁকে ঠকিয়েছে তার ঠিক নেই। কিন্তু এ-সব ছিল একরকম ইচ্ছা করেই ঠকা। বলতেন, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাতে চাইনে। নিজে ঠকেও যদি মানুষের সম্বন্ধে বিশ্বাস অটুট থাকে তবে সেই তো ভালো। নইলে যদি ভুল করেও কাউকে অবিশ্বাস করি তো সে কতবড়ো অন্যায়। নিজের সামান্য ক্ষতি হ'ল কিনা এ-কথা তার কাছে কত তুচ্ছ।" আমাদের অনেকবার বলেছেন, "তোমরা বোঝো না। আমার সন্দিগ্ধ মন। জানো তো আমাদের বংশে পাগলামির ছিট আছে, আর পাগলামির একটা লক্ষণ হচ্ছে সন্দেহবাতিক, তাই তো আমাকে আরো বেশি সাবধান হতে হয় পাছে কারোর সম্বন্ধে অন্যায় সন্দেহ করি। সন্দেহ আমার হয়। অন্য লোকের চেয়ে হয়তো বেশিই হয়, তাই বারে বারে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি।"

অনেক সময় লোকের উপর রাগ করতেন, বিরক্ত হতেন। কিন্তু কারোর সম্বন্ধে রাগ বা বিরক্তি বেশিক্ষণ পুষে রাখতে পারতেন না। বলতেন, "যখন

কারো উপরে রাগ করি তখন বুঝি যে আমি আত্মবিস্মৃত হচ্ছি। তাতেই আমার লজ্জা। তাই চেষ্টা করি যত শীঘ্র পারি মন থেকে রাগ বিরক্তি ঝেড়ে ফেলতে।" ওঁর নিজের কাছেই একটা গল্প শুনেছি। মেজো মেয়ে যখন মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত তাকে আলমোড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে শরীর আরো খারাপ হওয়ায় তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরিয়ে আনা স্থির হ'ল। যানবাহনের অভাব। মেয়েকে ডাণ্ডিতে চড়িয়ে অনেক দূরের পাহাড়ে পথ নিজে পায়ে হেঁটে রেল স্টেশনে এসে পৌঁছলেন। ট্রেনে ফেরবার পথে, মাঝে কোন্ একটা স্টেশনে দেখলেন বেঞ্চির উপর থেকে দুশো টাকার ব্যাগ চুরি গিয়েছে। হাতে পয়সা নেই, খুবই বিপদ। কবি বলেছিলেন, "প্রথমে ভারি রাগ হ'ল লোকটার উপর যে, এরকম ভাবে টাকা চুরি করল। তার পরে চুপ করে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, যে-লোকটা নিয়েছে তার হয়তো খুব টাকার দরকার। আমার চেয়েও হয়তো তার ঘরে আরো বড়ো বিপদ। তখন ভাবতে চেষ্টা করলুম যে, টাকটা আমি তাকে দান করেছি। সে চুরি করেনি, আমি তাকে দিয়েছি যেই এ-কথা মনে করা, বাস্, আমার রাগ কোথায় মিলিয়ে গেল। মন শান্ত হ'ল।"

কবি বলতেন, "কোন্ কোন্ মন্দ কাজ করবে না এ হচ্ছে ধর্মশাস্ত্রের বিধি। ঈশ্বর কোনো বিশেষ নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি। তার শুধু একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন—প্রকাশিত হও। সূর্যকে বলেছেন, পৃথিবীকে বলেছেন, মানুষকেও বলেছেন। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর তাঁর শুধু এই আদেশ প্রকাশিত হয়!" তাই কোনো বিধিনিষেধের দিক দিয়ে কবি কখনো কোনো মানুষকে বিচার করেননি। মানুষকে দেখতেন ঠিক মানুষ হিসাবে। কোনো শুচিবাই তাঁর ছিল না। কবির লেখায় এই কথা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন 'ব্রাহ্মণ' কবিতায়।

তাই দেখেছি নিঃসংকোচে তাঁর কাছে এসেছে এমন সব লোক যাদের নীতিবাগীশেরা দূরে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। কোনোরকম মিথ্যা, কোনোরকম ক্ষুদ্রতা নীচতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু প্রচলিত প্রথা লঙ্ঘন করলেই কাউকে বর্জন করবে তা কখনো মনে করেননি। পিতামাতার সামাজিক অপরাধের জন্য তিনি ছেলেমেয়েদের কখনো অপরাধী করেননি। বলতেন, "মানুষ ভুল করে এ-কথা সত্য। কিন্তু এইটাই সবচেয়ে বড়োকথা

নয়। কে কী ভুল করেছে বা অপরাধ করেছে তার চেয়ে বড়ো কথা কে কী রকম লোক।"

সতেরো-আঠারো বছর আগেকার কথা। বিশ্বভারতী থেকে কলকাতায় একটি অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে। একটি মেয়ে খুব ভালো অভিনয় করতে পারে। কবি তাকে ডেকে পাঠালেন। নিজের নাটকে অভিনয় করার জন্য বললেন, আর কয়েকদিন ধরে তাকে গান আর অভিনয় শেখালেন। মেয়েটির কিন্তু সমাজে অত্যন্ত নিন্দা, সে অপাংক্তেয়। তার সঙ্গে অভিনয় করায় অনেকের ঘোর আপত্তি। বাধ্য হয়ে তাকে বাদ দিতে হ'ল। কবি কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন। আমাকে বললেন, "দেখো, মানুষের যেখানে সত্যিকারের ক্ষমতা আছে সেখানে সে বড়ো। মানুষের বড়ো দিকটাও যদি আমরা না নিতে পারি সে আমাদের দুর্ভাগ্য। আমার তো একে নিয়ে অভিনয় করতে কিছু বাধে না। কিন্তু কী করব, উপায় নেই। সকলের যখন আপত্তি, আমি একা কী করব?" মেয়েটিকে ডেকে এনে যে বাদ দিতে বাধ্য হলেন এ দুঃখ তাঁর কোনোদিন ঘোচেনি।

'ল্যাবরেটরি' নামে গল্প যখন প্রথম ছাপা হয়, কবি তখন অসুস্থ, অল্পদিন আগে তাঁকে কালিম্পঙ থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। বিকালবেলা গিয়ে শুনি, যে, দুপুর থেকে আমাকে খুঁজছেন। আমি যেতেই গল্পটা দেখিয়ে বললেন, "পড়েছ?" আমি বললুম, খুব ভালো লেগেছে। এ রকম জোরালো গল্প কম আছে।" বললেন "হাঁ, তোমার তো খুব ভালো লাগবেই। কিন্তু আর সকলে কী বলছে? একেবারে ছি ছি কাণ্ড তো? নিন্দায় আর মুখ দেখানো যাবে না! আশি বছর বয়সে রবি ঠাকুরের মাথা খারাপ হয়েছে—সোহিনীর মতো এমন একটা মেয়ের সম্বন্ধে এমন করে লিখেছে। সবাই তো এই বলবে যে এটা লেখা ওঁর উচিত হয়নি?" একটু হেসে বললেন, "আমি ইচ্ছা করেই তো করেছি। সোহিনী মানুষটা কীরকম, তার মনের জোর, তার লয়লটি, এই হ'লো আসলে বড়ো কথা—তার দেহের কাহিনী তার কাছে তুচ্ছ। নীলা সহজেই সমাজে চলে যাবে, কিন্তু সোহিনীকে বাধবে। অথচ মা আর মেয়ের মধ্যে কত তফাৎ—সেইটেই তো বেশি করে দেখিয়েছি।"

মানুষের মন, এই ছিল তাঁর কাছে আসল জিনিস। বাইরের রীতিনীতি সব সময়েই গৌণ। লেখা হয়নি এমন একটা নাটকের কথা বলি। কবির

কাছে শুনেছি, যে সময় 'কচ ও দেবযানী', 'গান্ধারীর আবেদন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' প্রভৃতি মহাভারতের গল্প নিয়ে লিখছেন তখন আরেকটা গল্পের কথাও মাথায় এসেছিল। যদুবংশের মেয়েদের দস্যুরা হরণ করে নিয়ে গেল, অর্জুনও তাদের রক্ষা করতে পারলেন না। প্রথমে ভেবেছিলেন চৌদ্দ অক্ষরের পদ্যে লিখবেন, কিন্তু সেই সময় অনেকগুলি লেখা ঐ ভাবে হওয়ায় এটাতে আর হাত দেননি। অনেকদিন পরে 'রাজা' আর 'অচলায়তম' যখন লেখা হয়, তখন ভেবেছিলেন এই নিয়ে একটা গদ্য নাটক লিখবেন। সেই সময় আমাকে বললেন কী ভাবে লেখবার ইচ্ছা। কৃষ্ণ, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই আর যদুবংশের সব বীরেরা বড়ো বড়ো, যুদ্ধ, বড়ো বড়ো কথা আর বড়ো বড়ো আদর্শ নিয়ে ব্যস্ত, মেয়েদের দিকে মন দেবার সময় নেই। মেয়েরা আছে শুধু ঘরকন্নার কাজ নিয়ে। কিন্তু তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। ওদিকে অনার্য দস্যুরা হ'ল পৃথিবীর মানুষ, তারা এসে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে, গান শোনায়। মেয়েদের মন তাদের দিকেই আকৃষ্ট হ'ল। মেয়েরাই তখন লুকিয়ে পাণ্ডবদের অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত নষ্ট করল—যাতে দস্যুরা তাদের সহজে হরণ করে নিয়ে যেতে পারে। দস্যুদের ঠেকাতে গিয়ে অর্জুন দেখেন তাঁর গাণ্ডীবের ছিলা কাটা। সমস্ত ব্যাপারটা তিনি বুঝলেন, কিন্তু তখন আর কিছু করবার সময় নেই। যে কারণেই হোক এ নাটকটা লেখা হয়নি। পরেও মাঝে মাঝে এই নাটকের কথা বলেছেন আর সঙ্গে হাসতে হাসতে বলেছেন, "এই নাটক লিখলে সকলে চটে যাবে, কেউ আমার রক্ষা রাখবে না।"

বিশ্ব-মানব

বিশ্ব-মানবের আদর্শ কবি তাঁর লেখায় বক্তৃতায় দেশে দেশে প্রচার করেছেন। কিন্তু শুধু মুখের কথায় তা আবদ্ধ ছিল না। নিজের ঘরে কোনো বিদেশী অতিথি এলে তাঁর মন খুশিতে ভরে উঠত। তাদের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। প্রত্যেকের জন্য একটা দেশী নাম তৈরি করতেন। নরওয়ে থেকে এলেন অধ্যাপক কোনো (Konow) তাঁর নাম হোলো কণ্ব। ডেনমার্ক থেকে একটি মেয়ে এল তার নাম দিলেন হৈমন্তী। কেউ বা বাসন্তী, এই রকম কত কী। বিদেশেও দেখেছি বারে

বারে বলেছেন, "অন্য দেশের লোকেরা যখন আমার কাছে আসে, আমাকে ভালোবেসে কিছু দেয়, হয়তো আমার একটু সেবা করে তখনি সব চেয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করি যে আমি মানুষ—সার্থক আমার মানবজন্ম।" তাই লিখেছেন :

জন্মবাসরের ঘটে
নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ, এ-কথা রহিল মোর মনে।
একদা গিয়েছি চিন দেশে
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন তুমি আমাদের চেনা ব'লে।···
অভাবিত পরিচয়ে
আনন্দের বাঁধ দিল খুলে।
ধরিনু চিনের নাম পরিনু চিনের বেশবাস।
এ-কথা বুঝিনু মনে
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে। — জন্মদিনে

শুধু কি বিদেশী মানুষ? দক্ষিণ-আমেরিকা বেড়াতে গিয়ে লিখেছিলেন :

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম —
কী তোমার নাম,
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়, হাসিতে তোমার পরিচয়।····
হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে শুধাই, বলো দেখি,
মোরে ভুলিবে কি?
হাসিয়া দুলাও মাথা; জানি জানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে
পড়িবে যে মনে।
দুইদিন পরে
চলে যাব দেশান্তরে,
তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা;—
মোরে ভুলিবে না। —পূরবী

গীতাঞ্জলিতে লিখেছেন, "কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই। দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।" এ-কথা তাঁর নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে কবির সঙ্গে সার্বিয়া থেকে বুলগেরিয়া যাচ্ছি। গভীর রাত্রে সীমানার কাছে ট্রেন দাঁড়িয়েছে। আকাশ জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে—বেশি ঠাণ্ডা নয়, আমাদের দেশের শীতকালের রাতের মতো। হঠাৎ শুনি কবির গাড়ির পাশে কে এসে বাঁশি বাজাচ্ছে তাঁকে শোনাবার জন্য। অজানা সুর, কিন্তু তার মধ্যে দেশী সুরের রেশ। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করল বাঁশি তখনো থামেনি। কে বাজাল, কী তার পরিচয় জানি না। কবির সঙ্গে তার দেখাও হ'ল না। কবি তার বাঁশি শুনলেন এই শুধু তার পুরস্কার।

বিদেশের ভালো দিকটা সর্বদা দেখেছেন কিন্তু গায়ের জোরে কেউ বিশ্ব-মানবের পথ রোধ করে দাঁড়াবে তা কখনো সহ্য করেননি। ১৯২৬ সালে মুসোলিনির নিমন্ত্রণে ইটালিতে গিয়েছিলেন। সেখানে ফ্যাসিস্ত তন্ত্রের ভালো দিকটাই শুধু তাঁকে দেখানো হ'ল। দিনরাত ঘিরে রইল শুধু গোঁড়া ফ্যাসিস্ত-পন্থীরা। নিজের লেখায় কবি মুসোলিনির প্রশংসা করলেন। ইটালি থেকে বাইরে যাওয়ার পরে অন্য দিকের কথা শুনতে পেলেন। প্রথমে ভিলনিউভ-এ দেখা হ'ল রোমাঁ রোলাঁ আর দুহামেলের সঙ্গে। পরে দেখা হোলো মাদাম সাল্‌ভাডোরি (Madam Salvadori), মাদাম সালভামিনি (Madam Salvamini), আঞ্জেলিকা ব্যালব্যানফ্‌ (Angelica Balbanoff), এই রকম সব লোকের সঙ্গে যাঁরা ইটালি থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে কবি তখন অস্থির হয়ে উঠলেন যে, এখন কী করা যায়। ইটালি সম্বন্ধে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। আমরা সারাদিন টাইপ করেও আর পেরে উঠি না। বার বার করে লিখছেন আর বদলাচ্ছেন, ঠিক মনের মতো হচ্ছে না। আহারনিদ্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। শরীর খারাপ হয়ে গেল। আমরা ওঁকে ভিলনিউভ থেকে জ্যুরিক্‌ সেখান থেকে ইন্‌স্ব্রুক তার পরে ভিয়েনা আর সেখান থেকে প্যারিসে নিয়ে গেলাম। য়ুরোপের সব চেয়ে বড়ো বড়ো ডাক্তাররা দেখলেন। কিছুতেই কিছু হয় না। কোনো জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারেন না। তার পরে লেখাটা যখন শেষ করে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে পাঠিয়ে দিলেন, তখন শান্ত হলেন। শরীর মন দুই ভালো হয়ে গেল।

শেষ বয়স পর্যন্ত ঠিক এই রকম। জার্মানি যখন নরওয়ে আক্রমণ করে, সন্ধ্যেবেলা শান্তিনিকেতনে রেডিয়োতে খবর পৌঁছল। শুনে ওঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, বললেন, "অসুররা আবার নরওয়ের ঘাড়ে পড়ল—ওরা কাউকে বাদ দেবে না।" তার পরে কয়েকদিন ধরে বারে বারে আমাদের বলেছেন, "নরওয়ের লোকজনের কথা মনে পড়ছে আর আমার অসহ্য লাগছে। তাদের যে কী হচ্ছে জানিনে।"

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কালিম্পঙ থেকে ওঁকে অজ্ঞান অবস্থায় নামিয়ে আনলুম। তার কয়েকদিন পরের কথা। শরীর তখনো এমন দুর্বল যে, ভালো করে কথা বলতে পারেন না, কথা জড়িয়ে যায়। একদিন খবর পেলুম আমাকে বার বার ডেকেছেন। কিন্তু পৌঁছতে খানিকটা দেরী হয়ে গেল। আমাকে দেখেই বললেন, "অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে ডাকছি, চীনদেশের লোকেরা যে যুদ্ধ করছে"—বলতে বলতে কথা জড়িয়ে এল। থেমে গেলেন। বললেন, "এত দেরি করলে কেন? যা বলতে চাচ্ছি বলতে পারছিনে। একটু আগে কথাটা খুব স্পষ্ট ছিল, এখন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে।" বুঝলুম, কিছু বলবার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। রুগ্ন শরীরে এতটা উত্তেজনা সহ্য হয়নি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। পাশে বসে অপেক্ষা করলুম। তখন থেমে থেমে ভাঙা ভাঙা কথায় বলে গেলেন :

"চীনদেশের লোকেরা চিরদিন যুদ্ধ করাকে বর্বরতা মনে করেছে। কিন্তু আজ বাধ্য হয়েছে লড়াই করতে দানবরা ওকে আক্রমণ করেছে বলে। এতেই ওদের গৌরব। ওরা যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছে এই হ'ল বড় কথা। ওরা যুদ্ধে হেরে গেলেও ওদের লজ্জা নেই। ওরা যে অত্যাচার সহ্য করেনি, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এতেই ওরা অমর হয়ে থাকবে।"

বুঝলুম কী বলতে চান। 'নৈবেদ্য'র কবিতায় অনেকদিন আগে লিখেছিলেন :

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে ; যেন রসনায় মম
সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গ সম
তোমার ইঙ্গিতে।

আশি বছর বয়সে, জীর্ণ শরীরে, কঠিন রোগের সময়েও ভুলতে পারেননি চীনদেশে কী কাণ্ড চলেছে। বিছানায় উঠে বসবার ক্ষমতা নেই, তখনো ভুলতে পারেননি যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। শেষবয়সেও লিখছেন :

মহাকাল সিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী।....

মৃত্যুর তিন মাসে আগেও 'সভ্যতার সংকটে' লিখেছেন :

"আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা ক'রবো। আশা করবো মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।

শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল তাঁর এই বিশ্বাস। রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর আস্থা। জার্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, শেষ অসুখের মধ্যেও বারে বারে খোঁজ নিয়েছেন রাশিয়াতে কী হচ্ছে। বারে বারে বলেছেন, সব চেয়ে খুশি হই রাশিয়া যদি জেতে। সকালবেলা অপেক্ষা করে থাকতেন যুদ্ধের খবরের জন্য। যেদিন রাশিয়ার খবর একটু খারাপ, মুখ ম্লান হয়ে যেত, খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন।

যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আধ ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা : "রাশিয়ার খবর বলো।" বললুম, "একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে।" মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "হবে না? ওদেরইতো হবে। পারবে। ওরাই পারবে।"

তাঁর সঙ্গে আমার এই শেষ কথা। আমি ধন্য, যে, সেদিন তাঁর মুখের জ্যোতিতে আমি দেখেছি বিশ্বমানবের বন্দনা।

১৯৪২, ৯ই আগষ্ট, রবিবার কবির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মুখে বলা হয়। পরে পরিবর্ধিত আকারে লেখা।

লিপিকার সূচনা

১৯১৯ সাল। গরমের ছুটি হয়ে গিয়েছে। কলেজ বন্ধ। বাইরে যাই নি। পাঞ্জাবের কথা অল্প অল্প ক'রে আসছে লোকমুখে। কবি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। কিছু খবরের কাগজে, কিছু চিঠিতে, জালিয়ানালা-বাগের খবর এসে পৌঁছচ্ছে। রুচিরাম সাহনির কাছ থেকে অনেক-কথা এক দিন বানোয়ারিলাল চৌধুরী কবিকে এসে শুনিয়ে গেলেন। কবি সেই সব শুনে ক্রমেই এমন অস্থির হয়ে পড়লেন যে আমাদের ভাবিয়ে দিলে। রথীবাবুরা বাইরে। আমি মেজোমামাকে (সার নীলরতন সরকার-) ডেকে আনলুম। কবির শরীর তখন এমন দুর্বল যে দোতলা থেকে তিনতলায় উঠতে কষ্ট হয়। সারাদিন একটা লম্বা চেয়ারে শুয়ে। লেখা বন্ধ। কথাবার্তা কম বলেন। হাসি-গল্প তো নেই-ই। মেজোমামা দেখে Complete rest-এর হুকুম দিয়ে গেলেন। শুয়ে থেকে কবি আরও অস্থির হয়ে উঠলেন। Andrews সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। পাঞ্জাবে যে কাণ্ড ঘটছে, তা নিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একজন লোকও প্রতিবাদ করবে না, এটা কবির পক্ষে অসহ্য। Andrews সাহেবকে মহাত্মাজির কাছে পাঠালেন এক প্রস্তাব নিয়ে। তখন বাইরে থেকে পাঞ্জাবে লোক প্রবেশ করা নিষেধ হয়েছে। কবির ইচ্ছা যে মহাত্মাজি যদি রাজী থাকেন, তবে মহাত্মাজি আর কবি দুজনে দিল্লীতে গিয়ে মিলবেন। সেখান থেকে দুজনে এক সঙ্গে পাঞ্জাবে প্রবেশ করবার চেষ্টা করবেন। ওঁদের দুজনকেই তা হলে গ্রেপ্তার করতে হবে। এই হবে ওঁদের প্রতিবাদ। Andrews সাহেব মহাত্মাজির কাছে চ'লে গেলেন।

এ দিকে কবির দিন কাটে না। Andrews সাহেবের পথ চেয়ে ব'সে আছেন। ইতিমধ্যে Andrews সাহেব গান্ধিজির কাছ থেকে ফিরে এলেন। Andrews সাহেব আসতেই অন্য সব কথা ফেলে [কবি] জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হোলো? কবে যাবেন? Andrews সাহেব একটু আস্তে আস্তে বললেন, বলছি সব—গুরুদের কেমন আছেন এই সব কথা পাড়ছেন; কবি আবার বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে কী হোলো? তখন Andrews সাহেব বললেন যে, গান্ধিজি এখন পাঞ্জাব যেতে রাজী নন— I do not

want to embarrass the Government now—শুনে কবি একেবারে চুপ হয়ে গেলেন। এ সম্বন্ধে আর কোনো কথা বললেন না।

বিকালবেলা জোড়াসাঁকোয় গিয়ে শুনি, কবি একটু আগে একটা ঠিকে গাড়ী ডাকিয়ে বেরিয়েছেন। কোথায় কেউ জানে না। কবি যখন যেখানে যান আমিই ব্যবস্থা করি—আমাকে কোনো খবর দেন নি।

বেশ যখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে—সাড়ে সাতটা, পৌনে আটটা হবে—কবি একটা ঠিকে গাড়িতে ফিরে এলেন। দেখলুম কবি খুব বিচলিত।

রাত্রে ভালো ঘুম হোলো না। ভোর হয় নি—হয়তো চারটে হবে—উঠে স্নান ক'রে বেড়িয়ে পড়লুম। আমাদের সমাজপাড়ার পশ্চিম দিক দিয়ে সরকার লেনের রাস্তায়। গলিতে তখনো গ্যাসের আলো জ্বলছে। জোড়াসাঁকোয় গিয়ে দেখি দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। গরমের দিন, দয়োয়ানরা বাইরে খাটিয়াতে শুয়ে। তাদের জাগিয়ে দরজা খুলিয়ে উপরে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সিঁড়ির উপরের জানলা দিয়ে দেখলুম বসবার ঘরের উত্তর-পুবের দরজার সামনে টেবিলে ব'সে কবি লিখছেন। পুব দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছেন। পাশে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। আকাশ একটু ফর্সা হয়েছে। কিন্তু ঘর তখনো অন্ধকার। আমি ঘরে যেতেই মুখ ফিরিয়ে বললেন, কী এসেছো? এই বলে আবার লিখতে আরম্ভ করলেন। দু তিন মিনিট। তার পরেই একখানা কাগজ হাতে দিয়ে বললেন পড়ো। বড়োলাটকে লেখা নাইটহুড পরিত্যাগ করার চিঠি। আমি পড়লুম।

কবি তখন বললেন—সারারাত ঘুমোতে পারি নি। বাস্ এখন চুকলো। আমার যা করবার তা হয়ে গিয়েছে। মহাত্মাজি রাজী হলেন না পাঞ্জাবে যেতে। কাল তাই নিজেই গিয়েছিলুম চিত্তরঞ্জনের কাছে। বললুম যে, এই সময় সমস্ত দেশ মুখ বন্ধ ক'রে থাকবে এ অসহ্য। তোমরা প্রতিবাদ-সভা ডাকো। আমি নিজেই বলছি যে, আমি সভাপতি হবো। চিত্ত একটু ভেবে বললে, বেশ। আর কে বক্তৃতা দেবে? আমি বললুম, সে তোমরা ঠিক করো। চিত্ত আরেকটু ভাবলে—বললে, আপনি যদি সভাপতি হন, তবে তার পরে আর কারুর বক্তৃতা দেওয়ার দরকার হয় না। আপনি একা বললেই যথেষ্ট। আমি বললুম, তাই হবে। এবার তবে সভা ডাকো। তখন চিত্ত বললে, আপনি একা যখন বক্তৃতা দেবেন, আপনিই সভাপতি, তখন সবচেয়ে ভালো হয় শুধু আপনার নামে সভা ডাকা। বুঝলুম ওদের দিয়ে হবে না।

তখন বললুম, আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। এই ব'লে চলে এলুম। অথচ আমার বুকে এটা বিঁধে রয়েছে কিছু করতে পারবো না, এ অসহ্য। আর আমি একাই যদি কিছু করি। তবে লোক জড়ো করার দরকার কি? আমার নিজের কথা নিজের মতো ক'রে বলা-ই ভালো। এই সম্মানটা ওরা আমাকে দিয়েছিল। কাজে লেগে গেল। এটা ফিরিয়ে দেওয়ার উপলক্ষ ক'রে আমার কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম।

আস্তে আস্তে তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। ঘরের আলো নিবিয়ে দিলুম। Andrews সাহেব এলেন। বড়োলাটকে তার পাঠানো—খবরের কাগজে দেওয়ার জন্য কপি তৈরি ক'রে তিনি বেরিয়ে গেলেন। রামানন্দবাবুকে এক কপি এনে দিলুম। এই সব করতে খানিকটা বেলা হয়ে গেল। দুপুরের দিকে আর জোড়াসাঁকোয় যাই নি। বিকালে গিয়ে শুনি কবি দোতলা থেকে তিন-তলায় চলে গিয়েছেন। দক্ষিণের শোবার ঘরে গিয়ে দেখি একটা ছোটো বাঁধানো খাতা, লাল মলাট দেওয়া। তাতে কী লিখছেন। আমি যেতেই বললেন, এই শোনো আরেকটা লেখা, লিপিকার প্রথম যেটা লেখা হয় "বাপ শ্মশান থেকে ফিরে এলো"। তখন পাঞ্জাব কোথায়, জালিয়ানালাবাগ কবির মন থেকে মুছে গিয়েছে। দিনের পর দিন এক একটা ক'রে "লিপিকা"-র লেখা চলতে লাগলো। শরীরের ক্লান্তি, সমস্ত অসুখ তখন এক দিনের মধ্যেই সেরে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত চিঠিপত্র-৯ পুস্তকের গ্রন্থপরিচয়ে আংশিক উদ্ধৃত। উপরে তাহাই সংকলিত।

ধর্মের নবযুগ

রবীন্দ্রনাথের জন্মের নব্বই বছর আগে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন রামমোহন রায়ের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন রামমোহনের বিশেষ স্নেহের পাত্র।

রামমোহন রায়ের নিজের জীবনে, আর তাঁর যুগে, পূর্ব ও পশ্চিমে ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত ও শুরু হল আমাদের দেশে। স্যার উইলিয়ম জোন্‌স-এর চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের কাছে নতুন করে প্রাচ্য সাহিত্যের আবিষ্কার হলো। আর অন্য দিকে ইংরাজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য যুগসন্ধির সঙ্গে পরিচয়ের উত্তেজনা বাংলাদেশে প্রবল হয়ে উঠলো। এই যুগসন্ধির সময় রবীন্দ্রনাথের জন্ম। রামমোহন রায়, হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্টান ধর্মের মত, বিশ্বাস, শাস্ত্র আর ইতিহাস খুঁটিয়ে আলোচনা করলেন। তাঁর মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে, নানা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে গভীর ঐক্য আছে, যার মূল ভিত্তি হচ্ছে একেশ্বরবাদ। এই বিশ্বাসের উপরে নির্ভর করে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের কাজ আরম্ভ করলেন।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল পর্যন্ত মোটামুটি রামমোহন রায়ের আদর্শ ও প্রভাব বাংলা দেশে ভিতরে ভিতরে কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায়, নানা ভাবে, বারে বারে বলেছেন যে তিনি রামমোহনের অনুবর্তী। রামমোহনের মৃত্যু-শতবার্ষিকীতে ১৯৩৩ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

"মানব ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায় যেখানে কোনো অন্ধতায়, কোনো মূঢ়তায়, মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়। মানব সমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই—হচ্ছে, মানুষের এক হবার অনুশীলনা।"

"রামমোহন রায় উদার প্রশস্ত পন্থায় সকলকেই আহ্বান করেছেন। যে পন্থায়, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেই অবিরোধে মিলিতে পারে। মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল। তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খৃষ্টানকে, ভারতের সর্বজনকে, হিন্দুর এক পংক্তিতে, মহা-অতিথিশালায়।"

রবীন্দ্রনাথ নিজেও বারে, বারে, নানা বিচিত্র সভ্যতার ধারা, নানা বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনের কথা বলেছেন। এই ভাবটি প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় একটা নতুন কথা ব্যবহার করলেন বিশ্বমানব। তাঁর কাছে এই বিশ্বমানবের আদর্শ কোনো অবাস্তব, আকাশ-কুসুমের মতো জিনিস ছিল না। একে ধরাছোঁয়া যায়। বিশ্বমানব হচ্ছে, মানুষের সব রকম আদর্শের আধার। তার প্রকাশ হবে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। এক দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীর ঐক্যের মধ্যে। নানা ভাষা, নানা সভ্যতা, নানা সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বমানবের প্রকাশ। এক একজন মানুষের জীবনকাল, এক এক সভ্যতা, এক এক সংস্কৃতির অভ্যুদয়, ইতিহাসের উত্থান ও পতন অতিক্রম করে, বিশ্বমানবের শাশ্বতরূপ।

এই বিশ্বমানব কথাটি ব্যবহার করার অনেক আগে থেকে, রবীন্দ্রনাথের লেখায়, এই বিশ্বমানব ভাবটির পূর্বাভাস পাওয়া যায়। যেমন, প্রত্যেকটি ভাষার বৈশিষ্ট্য ও তাহার মূল্য সম্বন্ধে তিনি বারে বারে আলোচনা করেছিলেন। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাংলা ভাষারও স্থান আছে, প্রয়োজন আছে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর তেইশ বছর বয়সে।

পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ শুনিতে পেয়েছি ওই
সবাই এসেছে লইয়া নিশান কৈরে বাঙালী কই—
উঠ বঙ্গ কবি মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষেরে দাও প্রাণ
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাহি বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি, গান গেয়ে কবি
জগতের তলে স্থান কিনে দাও তুমি।

তিরিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আন্দোলন আরম্ভ করলেন যে, বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালীর শিক্ষা দেওয়া চাই, শিক্ষা দেওয়া হোক। এই নিয়ে অনেক বিরুদ্ধতা বিদ্রূপ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :—

বিশ বাইশ বছর ধরিয়া আমরা যে সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া

আমাদের মনের ভারি একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলির কতক আঠা দিয়ে জোড়া থাকে আর কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। একই লোক একদিকে ইউরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চিরন্তন কুসংস্কারগুলি সযত্নে পোষণ করিতেছেন। একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্যদিকে অধীনতার শত সহস্র নীতিতন্ত্রের পাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন। শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয়। এই মিলনকে সাধন করতে পারে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :—

যথার্থ সাহিত্য যেমন জাতীয় ঐক্যের ফল তেমনই জাতীয় ঐক্যসাধনে প্রধানতম উপায় সাহিত্য। পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে। যাহা অনুভব করিতেছি তাহা প্রকাশ করিতে পারিব। যাহা শিক্ষা করিতেছি তাহা রক্ষা করিতে পারিব। যাহা লাভ করিতেছি, তাহা বিতরণ করিতে পারিব। এমন একটা ক্ষমতার অভ্যুদয় হইলে তাহা সমস্ত জাতির উল্লাসের কারণ হয়। তাহারই অপেক্ষা করিয়া আমরা পথ চাহিয়া আছি।"

সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই হল ভিতরকার কথা। ওই কথাটা কিছুদিন পরে আরো পরিষ্কার করে আলোচনা করেছেন।

"মনে আছে আমারই কোনো এক প্রবন্ধ লইয়া আলোচনা উঠিয়াছিল, যে বাংলা ভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃতের মতো করিয়া তোলা উচিত। কারণ তাহা হইলে গুজরাটি, মারাঠি সকলের পক্ষেই বাংলা ভাষা সুগম হইবে। অবশ্য এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাংলা ভাষার যে একটি নিজস্ব আছে অন্য দেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা বুঝিবার সেইটাই প্রধান বাধা। অথচ বাংলা ভাষায় যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সৌন্দর্য, সমস্তই তাহার সেই নিজস্ব লইয়া। অতএব বাঙালী বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়া সাহিত্যের যদি উন্নতি করে, তবেই হিন্দীভাষীদের সঙ্গে তাহার বড় রকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দীভাষীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য, হিন্দীর ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে, তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে, এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃকপাতও করিবে না। সকল প্রকার ভেদকে ঠেকিতে কুটিয়া একটা

পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকলকার মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা, বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে সুবিধা, তাহা দুদিনের ফাঁকি। বিশেষত্বকে মহতে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।"

সাইত্রিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। এই সময়ের লেখার মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সংঘাত যে বিশ্বমানবের আদর্শকে আঘাত করে, বাধা দেয়, এই ভাবটি পরিচয় পাই।

"স্বার্থের প্রকৃতি বিরোধ। ইউরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে।...ইউরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রকাশ্যভাবে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। জোর যার মুল্লুক তার এই নীতি স্বীকার করিতে অপমান বোধ করিতেছি না।"

উনবিংশ শতাব্দী যেদিন শেষ হলো, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :—

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে অস্ত গেল
হিংসার উৎসবে আজি বাজে অস্ত্রেঅস্ত্রে
মরণের উন্মাদ রাগিণী ভয়ঙ্করী।
দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী তুলেছে কুটিল ফণা
চক্ষের নিমেষে গুপ্ত বিষদন্ত তার ভারি তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম
প্রলয় মন্থন ক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা
উঠিয়াছে জাগি পঙ্ক শয্যা হতে"

লিখেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিনে। সত্তর বছর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজকের দৃশ্যই যেন সেদিন দেখেছিলেন :—

"শতাব্দীর সূর্য আজি অস্ত গেল রক্তমেঘ মাঝে"

রবীন্দ্রনাথের মনে বিশ্বমানবের আদর্শ ক্রমে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তিনি বললেন :—

"জগত জুড়িয়া সমস্যা এই নহে যে, কি করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব, কিন্তু কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া মিলন হইবে। সে কথাটা কঠিন, কারণ সেখানে কোনো প্রকার ফাঁকি চলে না। সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নয়। কিন্তু যেটা

সহজ সেটা সাধ্য নয়। পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায়, যেটা কঠিন সেটাই সহজ।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে :—

"নানা পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা। বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে পরিষ্কার করা।"

আবার ফিরে আসি, বিশ্বমানবের আদর্শে, যা প্রকাশ পায়, বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনে। সাহিত্যকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মিলনের সেতু।

আজ বলবার দিন এসেছে, যে বাংলা সাহিত্য হোক মিলনের সেতু, সমস্ত বাংলা দেশের। রাজনীতির দিক দিয়ে নয়। সংস্কৃতির দিক দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন :—

"…তোমায় আমায় দেখা শত শত বার
একদিন জনহীন তমাল পুলিনে
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান
তোমারে সপিয়াছিনু আমার পরাণ
হে পদ্মা আমার॥"

সেই পদ্মা আজও চলেছে, যদিও পশ্চিমবঙ্গে নয়, সে চলেছে, বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। আজ সেই মিলনের আদর্শ সার্থক হোক রবীন্দ্রনাথের —যে রবীন্দ্রনাথ সংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ নয়, যে রবীন্দ্রনাথ কোনো গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা :—

"বাঙালীর পণ, বাঙালার আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান॥"
"বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন—
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান॥"

রবীন্দ্রনাথ আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। বারে বারে বলেছেন, বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ।

"বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটু ত্রুটি থাকতে পারে না এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাইরের জগতের সকল সঙ্কট তরে যাচ্ছে। এখনো যারা বিশ্ব ব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায়, এবং দায়ে ঠেকলে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্য যাদের মন ঝোঁকে, বাইবের বিশ্বে তারা সকলদিকেই মার খেয়ে মরছে, তারা আর কর্তৃত্ব পেলো না।

* * *

পশ্চিম দেশে পলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ কখন থেকে দেশের সকল লোক এ কথা বুঝেছে যে, রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতি সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে, যখন থেকে তারা জেনেছে সেই নিয়মই সত্য, যে নিয়ম ব্যক্তি বিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না।...সে বিধান শাশ্বতকালের। আজ একরকম, কাল একরকম নয়। বাহিরের জগতেও যেমন, নিজের জ্ঞান ও আনন্দের মধ্যেও সেই বিশ্ব সত্তাকে উপলব্ধি করা, এই হচ্ছে মানব-ধর্মের উদ্দেশ্য।"

"ব্রহ্ম যে সত্য-স্বরূপ তাহা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞান-স্বরূপ তাহা আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি। তেমনি তিনি যে রস স্বরূপ, তাহা কেবল ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে সে দেখা আমরা দেখিয়াছি এবং সে কথা আমাদিগকে দেখাইয়া চলিতে হইবে।"

আজ স্মরণ করি, ধর্মের নবযুগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাণী :—

নিজেকে যেমন সমস্ত আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া সত্য করিয়া দেখিতে হইবে নিজের ধর্মকেও তেমনি করিয়া তাহার সত্য আধারের মধ্যে দেখিবার সাধনা করা চাই। আমাদের ধর্মকেও যখন সংস্কারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবল তাহাকে নিজের নানা প্রকার ক্ষুদ্রতার

দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম, করিয়া ফেলি।

* * *

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে এই বাংলা দেশে আজ প্রায় শত বৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের ঐক্য, তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানুষের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পরে আজ একশত বৎসর অতীত হলো। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা, তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে; কিন্তু সেই অতীতকালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই। তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামীকালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়। বায়ুপোতে অত্যূর্ধ্ব আকাশে যখন ওঠা যায় তখন দৃষ্টিচক্র যতদূর প্রসারিত হয়, তার একদিকে থাকে যে দেশকে বহু দূরে অতিক্রম করে এসেছি, আর একদিক থাকে সম্মুখে, যা এখনো আছে বহুযোজন দূরে। রামমোহন রায় যে কালে বিরাজ করেন সে কালে তেমনি অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।

হে বিশ্বমানবের দেবতা, হে বিশ্বসমাজের দেবতা, এ কথা যেন আমরা একদিনের জন্যও না ভুলি যে, আমার পূজা সমস্ত মানুষের পূজারই মত, আমার হৃদয়ের নৈবেদ্য সমস্ত মানবজয়ের নৈবেদ্যেরই একটি অর্ঘ্য।....

হে ধর্মরাজ, নিজের যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা সর্বমানবের ধর্মকে উজ্জ্বল করিতে হইবে, বন্ধনকে মোচন করিতে হইবে।....

হে যুগান্তবিধাতা, আজ তোমার প্রলয়লীলার ক্ষণে ক্ষণে দিগন্তপট বিদীর্ণ করিয়া কতই অভাবনীয় প্রকাশ হইতে থাকিবে, বীর্যবান মানবের সহিত আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিব তাহাকে জয়শঙ্খধ্বনির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য আমাদের সমস্ত দ্বার বাতায়ন অসঙ্কোচে উদ্ঘাটিত করিয়া দিব।...আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া, ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয়রথযাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগদান করিতে পারি।

জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর,
মানবভাগ্যবিধাতা।"

সুখও নয়, দুঃখও নয়, শুধু শান্তি

প্রস্তাবনা

কয়েকদিন আগে প্রশান্তচন্দ্রের কাগজপত্র সব গোছাতে গিয়ে এই লেখাটা হাতে ঠেকলো। ৮ই মার্চ, ১৯৪২ সালে শান্তিনিকেতনে বসে লেখা একখানা চিঠি স্নেহের পাত্রীকে লেখা। এটা এমন একটি চিঠি যেটাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের প্রথম পরিচয়ের একটা অধ্যায় যেন ছবির মতো ফুটে উঠেছে। কবির সে সময়কার সহজ নিরাড়ম্বর জীবনযাত্রার কথা এখনকার দিনে অনেকেই জানে না। তাদের কাছে তাই এই লেখাটা অতি মূল্যবান মনে হবে বলে আমি প্রশান্তচন্দ্রের চিঠিখানা ছাপতে দিলাম। কবির সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের জীবনের গ্রন্থিবন্ধন দিনে দিনে তিলে তিলে কেমন করে গড়ে উঠেছিল তার ইতিহাসটা ফেলে দেবার মতো জিনিস্ না বলেই আমার বিশ্বাস। আজকের দিনে রবীন্দ্রগবেষণা নিয়ে যাঁরা রত আছেন, তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই এর মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য একজন মানুষ, যার সমগ্র জীবনটাই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দিয়ে তৈরী, যিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শকেই নিজের জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন, যাকে রবীন্দ্রনাথেব মন্ত্রশিষ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না, কবির মৃত্যুর বেদনা তার নিজের এই লেখার ভিতর দিয়ে কি রকম করে ফুটে উঠেছে তা সবাই দেখতে পাবে। প্রশান্তচন্দ্রের মনের অনুভূতি কখনো বাইরে প্রকাশ পেত না। অন্তরের গভীরে ফল্গু নদীর মতো স্নেহ ভালোবাসা শ্রদ্ধার প্রবাহ নিত্য বয়ে যেত, কিন্তু বাইরে তার কোনো উচ্ছ্বাস কখনও দেখিনি। তাই যদি কখনও সামান্য প্রকাশের আভাস কোনো দিন দেখেছি তাতেই বুঝতে পেরেছি সেটা কতখানি। যেদিন এই লেখাটা লিখেছিলেন সেদিনকার কথা মনে পড়ছে। সেদিনও আমার স্বামীকে বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারেনি যে, তাঁর অন্তর জন্ম-মৃত্যুর তরঙ্গে কি রকম উদ্বেল হয়ে রয়েছে সারাক্ষণ। এ বিষয়েও তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

"Uttarayan"
Santiniketan
Bengal
৮ই মার্চ ১৯৪২

কল্যাণীয়াসু,

আট মাস পরে শান্তিনিকেতনে এসেছি। কবি যাওয়ার পরে এই প্রথম। কাল ট্রেনে আসতে আসতে মনে পড়লো। ১৯১০ সালে, প্রায় বত্রিশ বছর আগে এইরকম একটা সকালের গাড়িতেই শান্তিনিকেতনে প্রথম আসি। এসেই কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। আর মনে পড়ছে ঠিক এক বছর আগে মার্চ মাসে দিল্লী থেকে ফিরতি পথে এখানে এসেছিলুম। পৌঁছেই কবির সঙ্গে দেখা হোলো। কাল থেকে বারেবারে মনে পড়ছে যে এবার আর দেখা হবে না। থেকে থেকে ভুলে যাই। মনে হয় এখনি দেখতে পাবো পাশে কোথাও রয়েছেন। বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে। কাল রাত্রে শুতে গেলুম। কবির সঙ্গে দেখা হয়নি। রাত্রে বারোটা, একটা বাজলো। মাঝে এই বত্রিশ বছরের কত কথা মনে পড়ছিলো। আজ সকালে উঠে কোনো তাড়া নেই। ভোর না হতে রানী উঠে চলে যায়—সূর্য্য ওঠার আগে উনি অপেক্ষা করে থাকবেন! সকালে চায়ের টেবিল থেকে উঠে বড়ো ঘরটার পাশ দিয়ে গেলুম—এই সময়টা আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। ঘরটা এখন museum করা হয়েছে। একবার উঁকি মেরে চলে এলুম। উপরে এসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি ফাল্গুন মাসে বৌঠানের বাগান ফুলে ফুলে উজ্জ্বল। পরশু কালবৈশাখীর ঝড় হয়ে গিয়েছে—সকালবেলার বাতাস আজও স্নিগ্ধ। দূরে কোপাই নদীর পারে ঘন সবুজ রঙ লেগেছে। সামনে কবির হাতে লাগানো গাছের পাতা আলোয় বাতাসে ঝলমল করছে। চুপ করে বসে আছি। এইরকম কতো সকাল বেলায় কবি গুনগুন করে গান ধরেছেন। পুরানো সব সুর যেন ভেসে আসছে।

বত্রিশ বছর আগের দিনগুলি মনে পড়ছে। অতো বড়ো একটা মানুষকে দেখেছি কতো কাছে থেকে। আজ ছোটখাটো কতো টুকরো দিনের কথা

মনে পড়ছে। বড়ো বড়ো কতো কাণ্ড ঘটেছে, কতো কবিতা, গান, অভিনয়। আজ মনে পড়ছে এ সমস্ত ছাপিয়ে ওঁর কাছে কতো স্নেহ পেয়েছি।

১৯১১ সালের গ্রীষ্মের ছুটীর আগে দুমাস শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে ছিলুম—তখন কলেজে পড়ি, সতেরো আঠারো বছর বয়স। তখন সারাদিন প্রায় ওঁর কাছে-কাছেই থাকতুম। শান্তিনিকেতন পুরানো Guest House-এর দোতলায় পূর্বদিকের সেই ছোটো ঘর-খানায় উনি থাকেন। এই ঘরে বসেই গীতাঞ্জলি, রাজা, ডাকঘর লিখেছেন। মাঝে একটা বসবার ঘর। আমি থাকি পশ্চিমের ঘরে। গ্রীষ্মকাল—আমি একটা মাদুর নিয়ে উপরের বড়ো ছাদে শুতাম।

কবির চাকর ছিল উমাচরণ—সেই আমাকে খাওয়াতো। সন্ধে বেলা আশ্রমের লোকজন দেখা করে যাওয়ার পরে দক্ষিণে গাড়িবারন্দার ছাদটায় উনি বসে থাকতেন একটা লম্বা চেয়ারে। সন্ধের আগেই আমাদের খাওয়া হয়ে যেতো। খুব সাদাসিধা। হয়তো একটু ফল, বা মিষ্টি আর এক গেলাস ঘোলের সরবৎ। রাত্রে সে সময় রান্না হোতো না। সকালবেলা চায়ের সময় পাঁউরুটি আর ফল। দুপুরে একটু ভাত আর দু-একটা নিরামিষ তরকারি—বোধহয় Icmic চলছে। আর কেউ নেই। রথীবাবু বৌঠান, মীরা সকলে শিলাইদায়। উমাচরণই সব ব্যবস্থা করতো। ঐ একজনই চাকর, রাঁধিয়ে সব কিছু।

সমস্ত কিছু ছিল সাদাসিধা। ছোটো ঘরখানায় খুব নীচু করে পাতা ওঁর বিছানা। এককোনে একটা ছোটো নীচু লেখবার ডেস্ক। এ ছাড়া তার আসবাবপত্র কিছু নেই। কয়েকখানা বই ডেস্কের একপাশে আর লেখবার সরঞ্জাম। ঘরে একসঙ্গে দু-তিন জনের বেশি মাটিতে বসবার জায়গা নেই। পাশেই ছোটো স্নানের ঘর। কাপড় চোপড়, পাজামা, পাঞ্জাবি, আর একটা জোব্বাগোছের জিনিষ সেই ঘরেই আলনায় টাঙ্গানো। সিঁড়ির পাশে একটা বাক্সে বোধহয় আর কিছু কাপড় থাকতো। বারান্দায় একটা গোল টেবিলে বসে খাওয়া। এই ছিল তখনকার ব্যবস্থা।

রাত্রে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলতে বলতে দেখতুম উনি চুপ করে আসছেন। আমি ছাদে চলে যেতুম। কোনো কোনো দিন আমিও অনেকবার ছাদে বেড়াতে বেড়াতে দেখতুম কবি তখনো স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। তারপরে গভীর রাতে কখন শুতে যেতেন। সূর্য ওঠবার আগে নীচে এসে দেখতুম যে কবি

তার অনেক আগে উঠেছেন। কোনোদিন বারান্দায় বসে আছেন। কোনোদিন বা মন্দিরে সামনে পূবদিকের চত্বরে গিয়ে বসেছেন। সকালবেলা চায়ের টেবিলে নানা রকম আলোচনা। কখনো কখনো বিদ্যালয় থেকে কেউ আসতেন কাজকর্মের কথা নিয়ে। কখনো অজিত চক্রবর্তী আসতেন কিছু আলোচনা করার জন্য। সকালে অনেকক্ষণ কবি নিজের লেখাও লিখতেন, চিঠির জবাব দিতেন। বেশ একটু বেলায় যেতেন স্নানের ঘরে। এই ছিল ওঁর অবসর। কখনো একঘণ্টা, কখনো দেড়ঘণ্টাও স্নানের ঘরে থেকেছেন। কখনো শুনেছি গান করছেন। দুপুরে খাওয়ার পরে আবার কাজ। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। লেখা। অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা। এছাড়া মাঝে মাঝে সকালে বা দুপুরে ক্লাশ পড়াতেন। কোনো নতুন গান লেখা হলেই অজিত বা দিনুবাবুকে ডেকে পাঠাতেন। বিকালে এক একদিন গান শেখানোর পালা। সন্ধেবেলায় আবার দু'চার জনের সঙ্গে কথাবার্তা। মাঝে মাঝে খানিকটা বেড়িয়ে আসতেন। কখনো বা বিদ্যালেয়ে যেতেন। দু একদিন নীচু বাংলা থেকে বড়োবাবু (কবির বড়োদাদা) এসে হাজির। খানিকটা দর্শন, বা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। এই রকম করে দিনের পরে ওঁকে দেখেছি ওঁর সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় এইরকম করে ঘটেছে। শেষের দিকে নিজের কাজ, নানা লোক, নানা ব্যবস্থা নিয়ে ওঁর কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিলুম। কিন্তু আগে শান্তিনিকেতনে এসে ওঁর কাছেই থাকতুম। বেশির ভাগ সময় কাটতো ওঁর কাছে।

বাঙ্গালী একটা স্বভাব আছে মাখামাখি করা। কবির ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ওঁর নিজের সব ইচ্ছায় চিরদিন একটা দূরত্ব ছিল। তাই এক একদিন যখন তার ব্যতিক্রম ঘটতো তখন ওঁর ভালোবাসার নতুন পরিচয় পেতুম। স্নানের ঘর উনি বরাবর আলাদা ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন। তাই ওঁর স্নানের ঘর কখনো কেউ ব্যবহার করতো না। কিন্তু একদিন মনে আছে গ্রীষ্মকালে দুপুরের গাড়িতে এসে পৌঁছেছি তখন বেলা বারোটা একটা হবে। জানতেন আমি আসবো। না খেয়ে অপেক্ষা করছেন। আমি যেতেই বল্‌লেন, যাও তোমার জন্য জল রেখে দিয়েছি স্নান করে এসো। তখন থাকতেন "দেহলি"র দোতলায়। সেখানে শুধু একটা ঘর। আমি থাকবো Guest House-এ, আরো খানিকটা হেঁটে যেতে হবে। বুঝলুম যে তা ইচ্ছা নয়। অন্য সময় হলে হয়তো না বলতুম। তাড়াতাড়ি স্নানের

ঘরে গিয়ে দেখি একটা পরিস্কার তোয়ালে. জল সব ঠিক করিয়ে রেখেছেন। এই রকম ছোটো ছোটো কতো কথা মনে পড়ছে।

সেও এক গ্রীষ্মের দিনের কথা। পঁচিশে বৈশাখের কাছাকাছি। সারা-দিন অসম্ভব গুমট গরমের পরে প্রকাণ্ড একটা কাল বৈশাখীর ঝড়ে বৃষ্টিতে ধুইয়ে দিলে। তখন ঝড়ের সময় মাঠে ঘুরতে বেরুনো ছিল একটা মস্তো বড়ো আনন্দ। শিলা বৃষ্টির মধ্যে সন্ধে বেলায় খুব দৌড়াদৌড়ি করে কাপড় ছেড়ে ওঁর কাছে গিয়ে বসেছি। হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। একটু পরেই উনি উঠে পাশের ঘরে গেলেন। একটা গরম কাপড় কোথা থেকে বের করে এনে গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন, বেশ ঠাণ্ডা আছে। আর বাহাদুরি করতে হবে না। অনেকদিন পর্যন্ত—আমার বিয়ে হবার আগে—ওঁর কিরকম একটা ধারণা ছিল যে আমার খাওয়া দাওয়া বা শোয়া সম্বন্ধে কিছু খেয়াল থাকে না। তাই সর্বদা ওঁর সঙ্গেই আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। আর শুতামও প্রায়ই ওঁর পাশে বা কাছাকাছি কোনো ঘরে। ওঁর বরাবর ছোটো ছোটো ঘরে থাকা অভ্যাস। নতুন নতুন বাড়ি যখন করতেন তখন গোড়ায় অনেক সময় একখানা বই দুখানা শোবার ঘর থাকতো না। তাই ওঁর বসবার ঘরে খাট ফেলে যে কতো শুয়েছি তার ঠিক নেই। একদিনের কথা মনে আছে। বোধহয় ১৯২২ সাল,—৭ই পৌষের উৎসবের আগের দিন বিকালের গাড়িতে এসে পৌঁছেছি। উনি তখন থাকেন "প্রান্তিক" বলে বোধহয় বাড়িটার নাম। একখানা ছোটো শোবার ঘর, আর প্রায় সেইরকমই ছোটো একটা বসবার ঘর, এককোনে সেই মাপের একটি স্নানের ঘর, আর চারদিকে শুধু বারান্দা। শোবার ঘরে একটা ছোটো খাটিয়া ফেলা হোলো। ঘরটা এতো ছোটো যে সেখান থেকে ওঁর তক্তপোষ তিন চার হাত দূরে। মাঝের দরজায় পর্দা ফেলা। তার ঠিক আগে আলিপুরে হাওয়া-আপিসে প্রথম গিয়েছি—উনি কয়েকদিন সেখানে আমার কাছে ছিলেন তখনো আমার বিয়ে হয়নি। জানতুম মীরার জন্য ওঁর মন খুব ব্যথিত আছে। রাত্রে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলবার পরে গিয়ে বারান্দায় বসলেন। আমি শুয়ে পড়লুম। তখন বেশ গভীর রাত। খানিকক্ষণ ঘুমবার পরে হঠাৎ শুনি উনি শোবার ঘরে, বোধহয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে, গান আরম্ভ করেছেন।

"অন্ধজনে দেহ আলো
মৃত-জনে দেহ প্রাণ।

তুমি করুণামৃত-সিন্ধু
করো করুণা-কণা দান ॥
শুষ্কহৃদয় মম কঠিন পাষান সম,
প্রেম-সলিল নীরে সিঞ্চহ শুষ্ক বয়ান।"

তখন বোধহয় রাত তিনটা হবে। দুঘণ্টা ধরে বারবার করে গাইতে লাগলেন। আস্তে আস্তে যাতে আমি জেগে না যাই। ভোরবেলা পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে শুনলুম। বুঝলুম যে গানের ভিতর দিয়ে মনকে শান্ত করছেন। এক একটা কথা কতোবার করে ফিরে ফিরে আওড়াতে লাগলেন। বাইরে থেকে গানের সুর শুনেও বোঝা যায় না, যে কতোখানি ভিতরের তাগিদে উনি গান লিখেছেন। শুধু গান কেন ওঁকে কাছে থেকে না দেখলে ওঁর সাহিত্য, ওঁর কবিতা, ওঁর লেখা যে কতোখানি সত্য ছিল ওঁর কাছে তা কেউ বুঝতে পারবে না। ফাল্গুন চৈত্র মাসে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন গান গাইতেন তখন ওঁর সমস্ত শরীর মন যেন সাড়া দিয়ে উঠতো। কাল বৈশাখীর ঝড়ে, বর্ষার দিনেও আবার দেখেছি ওঁর মন কেমন মেতে উঠেছে। যারা শুধু ওঁর লেখা পড়বে তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে কতোখানি বাদ পড়লো। এবার শান্তিনিকেতনে এসে থেকে থেকে খালি মনে হচ্ছে যে সমস্ত যেন বদলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধরে তো রাখা যায় না। আমরাও তো চলেছি। আমাদের দিনগুলিও একে একে নিবে আসছে। কালকের যে দিন সেটা ফুরিয়েছে বলেই তো আজকের দিনটিকে পেয়েছি। আবার আজকের দিনকে না চুকিয়ে দিলে কাল আবার নতুন দিন আসবে কি করে?

এ সবই জানি কিন্তু তবুও মনের মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। শুধু কবি সম্বন্ধে নয়। সব জানাশুনা, পরিচয় ভেঙে ভেঙে নতুন করে গড়ছে। যেখানে সৃষ্টি সেইখানেই তাই এত ব্যাথা। কিন্তু মানুষ তবু ধরে রাখতে চায়। আঁকড়িয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সে হোলো মোহ, নিতান্তই মিথ্যা। মহর্ষি শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে বলে দিয়েছিলেন যে ওঁর কোনো ছবি, কোনো প্রতিকৃতি যেন এখানে না রাখা হয়। ওঁর মনে ভয় ছিল, যে, এই মিথ্যাটাকে মালা চন্দন, ধূপধূনা দিয়ে পূজা ক'রে আশ্রমের আসল সত্যরূপটি চাপা পড়বে। কবি অনেক বার আমাকে এই কথা বলেছেন।

"সদর ষ্ট্রীটে থাকতে বাবামশায় আমাকে ডেকে বললেন, রবি তোমাকে আমি এই কথাটা বলে যাচ্ছি—এ দায়িত্ব তোমার। শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার কোন প্রতিকৃতি যেন না থাকে।"

তাই এখানে আজ পর্যন্ত আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতার কোন ছবি কোথাও নেই। কবির নিজের মনের ধারাও ছিল ঠিক তাঁর পিতার মতো। আমাকে একদিন বলেছিলেন—

"রামমোহন রায় যে ব্রিস্টলে মারা যান খুব ভালো হয়েছিল। এ দেশ এমন দুর্ভাগ্য—এখানে মরলে হয়তো ওঁকে পূজা করবার একটা জায়গা তৈরী হোতো।"

আজ রথীবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। গোড়ার দিকে "শ্যামলী" বাড়িটায় কবির খাট, বিছানা, চেয়ার, টেবিল, কাপড় চোপড় সব উনি যেমন ব্যবহার করতেন সেই রকম করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। লোকে দেখতে আসতো। ফুল দিয়ে যেতো। তারপরে ধূপধুনাও দেওয়া হয়। রথীবাবু সম্প্রতি জিনিষপত্র সরিয়ে সেখানে অন্য লোকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি অবশ্য তাতে সায় দিলাম। রথীবাবু বললেন, যে, "অথচ বাইরে থেকে যখন লোকজন আসে একটা কিছু ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। ভাবছি যে, যে ঘরটা উনি সব শেষে করিয়েছিলেন সেটা খালি করে, খুব পরিষ্কার করে রেখে দেবো। সেখানে ওঁর ব্যবহার করা কোনো আসবাব থাকবে না। কিন্তু ওঁর আঁকা এক একখানা ছবি, ওঁর কোনো বই বদলিয়ে বদলিয়ে রাখা হবে।" আমি বললুন, যে, তা হতে পারে কিন্তু এর চেয়েও আরো ভালো হয় অন্য একটা ব্যবস্থায়। শান্তিনিকেতন আশ্রমে বারবার করে কবি বলেছেন এখানকার এই উন্মুক্ত উদার প্রান্তরের কথা—দূরে যেখানে আকাশ আর মাটিতে মিশে গিয়েছে সেখানে পূব দিকে সূর্য ওঠা আর পশ্চিমে আবার সেইরকম করেই ডুবে যাওয়া। এখানকার এই খোলা মাঠের মধ্যে একটা জায়গায় একটু উঁচু করে আশেপাশে ফুলের গাছ দিয়ে সাজিয়ে দিন। তার উপরে হয়তো পাথরের একটি বেদী—কবি ব্যবহার করেছেন এমন কিছু নয়, কিন্তু শুধু দাঁড়াবার বা বসবার একটু জায়গা। কবি নিজের হাতে কাঁটা আর বুনো গাছের বাগান করেছিলেন—সেইরকম ছোটো ছোটো গাছ হয়তো এক এক পাশে। বিস্তীর্ণ প্রান্তর—চারদিক থেকে প্রশস্ত রাস্তা এসে মিশেছে। এই হোলো কবির যথার্থ স্মরণ-চিহ্ন। ওঁর মাটির দেহের কোনো চিহ্ন তাতে নেই—

আছে শুধু ওর ভিতরকার যে কথা তার একটা ইঙ্গিত। এইখানে লোকে এসে দাঁড়াবে। এইখানে খোলা আকাশের নীচে কবির কথা স্মরণ করবে। উৎসবের দিনে এই হবে আশ্রমের সকলের মেলবার জায়গা। কবির কথা যখন ভাবি এ ছাড়া আর কিছুতো তাঁর যোগ্য বলে মনে হয় না।

মানুষের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় তাকেও আমরা বারবার নানা রকম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে শুধু নিজেকেই ছোটো করি। তাই যেখানে আমাদের সত্যি দরদ সেইখানেই বারে বারে বন্ধন কাটবার প্রয়োজন আছে। তাতে মন ব্যথিত হয় ফিরে ফিরে আঁকড়িয়ে ধরতে চায়। তবু মনে রাখতে হবে, যে, সব চেয়ে বড়ো কথা মুক্ত রূপে জানা। কিন্তু মুখে যতো সহজে বলি মন তো অতো সহজে বোঝে না। থেকে থেকে সমস্ত যেন খালি হয়ে যায়। বারে বারে মনকে সামলাতে হয়। আজ সকালবেলা বসে বসে চেষ্টা করছি সেই অনুভূতিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য যা সুখও নয়, দুঃখও নয়, শুধু শান্তি।

ইতি—

ভুলদা